প্রভাত-রবি

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

প্রকাশনী

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীঅশোকবিকাশ ভট্টাচার্য
বাণীবিতান
৬৭ বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর · শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকা

মেজদাদার শ্রীচরণে

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষব্যাপী জীবনের প্রথম চতুর্থাংশকে প্রভাতকাল ধরিয়াছি। কবি এই কালকে "প্রাগৈতিহাসিক" বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। বস্তুত ইহার প্রাগৈতিহাসিকত্বের জন্য দায়ী তিনি স্বয়ং। সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া তিনি ওই কালের সমস্ত রচনাকে বর্জন করিয়াছিলেন। সেই কারণে সে কালের কাব্যকে ভুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও ভুলিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উদ্বোধন ও উৎসারণের ইতিহাস অঙ্কে ধারণ করিয়া যে "গুপ্তযুগ" আমাদের স্মৃতির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে, কবি নিজে যতই অবজ্ঞা করুন, আমাদের কাছে তাহার মূল্য অপরিমেয়। সে যুগকে আমরা ব্যক্ত দেখিতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বানান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র বানান অনুসৃত হইয়াছে। "রবীন্দ্র-রচনাবলী"র অচলিত-সংগ্রহের অনুসরণে কবির পুরাতন রচনার বানান যেমন ছিল তেমনই রাখা হইয়াছে।

প্রভাত-রবি রচনা উপলক্ষ্যে অনেকের কাছে হাত পাতিয়াছি। অনেকের সাহায্য না চাহিতেই পাইয়াছি। যাঁহাদের বলিবার সুযোগ হয় নাই তাঁহাদের দান আগে লইয়া পরে বলিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে পাদটীকায় তাহার পরিচয় আছে। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বাক্ষরসংযোগ করিয়া এই পুস্তকের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকারের প্রতি তিনি যে সমুদার দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

দানকে যদি ঋণ বলিয়া ধরা যায়—তাহাই দস্তর—তাহা হইলে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকেই বড় মহাজন বলিতে হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের কাছে কি কি সাহায্য পাইয়াছি তাহার হিসাব করা কঠিন বলিয়া সে দুঃসাধ্য প্রয়াসে বিরত রহিলাম। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একদিন মাত্র পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহার আলোচনায় উপকৃত হইয়াছি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে গিয়া যে সব ভ্রমপ্রমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পূর্ব হইতে নজরে না পড়িলে সেগুলির সংশোধন সম্ভব হইত না। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের অপ্রকাশিতপূর্ব ফোটোগ্রাফটি দিয়া শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ নন্দী আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে তাপসী প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। গ্রন্থকার-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁহার সহিষ্ণুতা অসাধারণ।

আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ভাদ্র, ১৩৫০

ভূমিকা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচিত্র রসপ্রবাহ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া যে আনন্দমহাসমুদ্রের সংগমস্থলে উত্তাল করিয়া দিতেছে তাহারই অমৃতস্রোতে অবগাহন করিয়া রবিপ্রতিভার উৎসমুখের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার কথা আমাদের মনে থাকে না; গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গিয়া গঙ্গোত্রীর কথা বিস্মৃত হই। যে শতদল পদ্মের সরস শুভ্র দলগুলি পূর্ণগৌরবে বিকশিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর আমোদিত করিতেছে তাহারও একদিন কোরকদশা ছিল, একদিন সেই কুঁড়ির ভিতর বদ্ধ থাকিয়া আকুল গন্ধ উন্মুখ আগ্রহে মুক্তিপথ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই। মধ্যাহ্নরবির বিশ্বগ্রাসী রশ্মিচ্ছটায় আমাদের দৃষ্টি অভিভূত, প্রত্যূষ-পূর্বাকাশের অনতি-উজ্জ্বল অরুণাভাস চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের সহিত বিশ্বের পরিচয় প্রধানত তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই। সে সাহিত্য বৃহৎ বনস্পতির মত শাখা-প্রশাখায়, পুষ্প পল্লবে পরিকীর্ণ হইয়া মহৎ মর্যাদায় গগনস্পর্শ করিয়াছে। অঙ্কুরোদ্‌গমের পুরাতন কাহিনী আজ বিস্মৃতির আচ্ছাদনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা মিথ্যা নয়। এই বনস্পতি যেমন সত্য সেই অঙ্কুরও তেমনই সত্য, কারণ আজিকার বনস্পতি এবং সেদিনকার সেই অঙ্কুর এক এবং অভিন্ন। প্রারম্ভকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণতির যে পরিচয় পাই তাহা খণ্ড পরিচয় মাত্র। মহামহীরুহের সম্পূর্ণ ইতিহাসের সূচনা তরুণাঙ্কুরের অন্তর্গত পত্রপুটের গোপন অন্তরালে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেই অন্তরাল ভেদ করিয়া রহস্যলোকের রুদ্ধদ্বার অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবে এ বিষয়ে আমার সংশয়মাত্র নাই।

রবীন্দ্রজীবনের যে অধ্যায় "প্রভাত-রবি"র উপজীব্য, তাহার আলোচনার পথ যেমন অস্পষ্ট তেমনই দুর্গম। বিলুপ্তপ্রায়, অর্ধবিস্মৃত এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু তথ্যের পাথেয় সংকলন ও সমাবেশপূর্বক গ্রন্থকার ওই সংকটসংকুল পথ অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছেন।

কবি লিখিয়াছেন: "অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে।"

"প্রভাত-রবি"র গ্রন্থকার বহুস্থলে সেই আত্মীয়তার প্রমাণের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন।

জীবনকথার সূত্র অবলম্বনে লেখক রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার ক্রমবিকাশের গতিপথ অনুসরণ করিয়া সাহিত্য-ইতিহাসের যে সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছেন "সন্ধ্যাসংগীত"-এর সংগীতসুধায় তাহা পবিত্র। "সন্ধ্যাসংগীত" এর জন্মদিনে বঙ্কিমের হাত দিয়া কবি বঙ্গবাণীর যে আশীর্মাল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার দিব্য সৌরভের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, "প্রভাত-রবি"র রচয়িতা শুধু সেই মালার নহে, উহার মালঞ্চ ও মালাকরের সন্ধানও দিয়াছেন।

লেখক দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের নিয়োগে কবির রিসার্চ-অ্যাসিস্টান্টরূপেও দুই বৎসরকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করিবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল। সে সৌভাগ্য যে ব্যর্থ হয় নাই এই "প্রভাত-রবি" তাহার প্রমাণ।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভাত-রবি

শ্যামের গণ্ডি

ঘাটবাঁধানো একটি পুকুর। পুকুরের পূর্বদিকে প্রাচীরের গায়ে একটা প্রকাণ্ড টানাবট আর দক্ষিণদিকে নারিকেল গাছের সারি।

সকাল হইতে লোকে স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বা দুই কানে আঙুল দিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া গোটা পাঁচেক ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। কেহ বা গামছাটাকে ছাঁকনি জালের মত পাট করিয়া তাহা দিয়াই জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে লাগিল। কেহ বা দুই হাতে জলের ময়লা ঠেলিয়া টপ করিয়া একটা ডুব দিয়াই উঠিয়া গেল। কেহ বা সিঁড়ি হইতেই ঝপাস করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

স্নানের শেষে কেহ বা গা-টি মুছিয়া কাপড়টি কাচিয়া ধীরে সুস্থে বাড়ি যাইতেছে। কাহারও চলন দেখিলে মনে হয় বাড়িতে ভয়ানক তাড়া, এখনই না পৌঁছিলে নয়। তাহাদের গা মুছিবারও অবসর নাই। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত এমনি ধারা নানারকম লোকের ভিড়ে পুকুরঘাট সরগরম।

দুপুর পার হইয়া যায়। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে। স্নানার্থীর ভিড় কমিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত পুকুরে আর মানুষ থাকে না, থাকে কয়েকটা রাজহাঁস আর পাতিহাঁস। তাহারা সারাদিন সাঁতার কাটে আর মাঝে মাঝে ডুব দিয়া দিয়া গুগলি তুলিয়া খায়।

পুকুরঘাটের ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটি বাড়ি। উহার দোতলার দক্ষিণ-পূব কোণের ঘরটি ঘাটের ঠিক সামনাসামনি। ঐ ঘরের জানালা প্রায় সারাদিন খোলা।

ঘাটে যাহারা স্নান করিতে আসিত, তাহারা কোনও দিন উপরে তাকাইয়া দেখিত কিনা কে জানে? কিন্তু যদি একবার মুখ তুলিয়া তাকাইত তাহা হইলে দেখিতে পাইত—একটি বালক খড়খড়ি খুলিয়া ঘাটের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। দেবশিশুর মত সুন্দর তার চেহারা।

শ্যামের গণ্ডি—সে বড় বিষম গণ্ডি। সে গণ্ডি পার হওয়া বড় কঠিন। পার হইলেই বিপদ। কি বিপদ কে জানে? কিন্তু নিশ্চয় বিপদ আছে।

শ্যাম ঐ বড় বাড়ির চাকর। বালকের ভার ছিল তাহার উপরে। সে ঘরের ভিতরে বসাইয়া বালকের চারিদিকে খড়ির দাগ কাটিয়া দিয়া যায়। বলিয়া যায়—গণ্ডি পার হইলেই বিষম বিপদ।

একদিন এই গণ্ডির বাহির হইয়াই তো সীতা বিপদে পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মণের গণ্ডি পার না হইলে রাবণ কি তাহাকে ধরিতে পারিত? সীতার কথা মনে করিয়া বালকের ভয় হয়। শ্যামের গণ্ডির বাহিরে পা দিতে আর সাহস হয় না। ঐ জানালার ধারে বসিয়া পুকুরের দিকে তাকাইয়াই সারাটা দুপুর এমনি ভাবে কাটিয়া যায়।

কে সেই বালক? কোথায় সেই বাড়ি? কোথা বা সেই পুকুরঘাট? এখনও কি সেই ঘাটে লোকে তেমনি স্নান করে? হাঁসের দল তেমনি সাঁতার কাটে? চীনা বটটি কি এখনও তাহার ছায়া মেলিয়া পুকুরের ধারে তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে?

পুকুরপাড়ের বাড়িটি আছে। আর সেদিনকার কিছুই অবশিষ্ট নাই।

পুকুর অনেকদিন বোজানো হইয়াছে। চাঁদা বটটিও নাই। নারিকেল শ্রেণীও অদৃশ্য হইয়াছে। যাহারা স্নান করিবার জন্য প্রত্যহ ঘাটে আসিয়া জুটিত তাহারা সকলে পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে।

সে শ্যাম গণ্ডি টানিত সে শ্যাম আর গণ্ডি টানিবে না। যাহার চারিপাশে গণ্ডি দেওয়া হইত সেও সেদিন গণ্ডি অতিক্রম করিয়াছে। সীতা গণ্ডির বাহিরে গিয়াও একদিন ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কি আর আসিবে?

আসিবে কি—সে তো আছেই! দেহটাই শুধু দেখিতে পাইতেছি না—আর তো সবই আছে। তাহাকে বাঁধিতে পারি এমন বাঁধন আমাদের ছিল না, তাই সে মুক্তি লইয়া নূতন করিয়া বন্দী হইয়াছে।

"সন্ধ্যা আকাশ বিনা ডোরে বাঁধল মোরে গো,
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা আমায় যাচে।"

কে বলে যে সে নাই? আজিকার "এই বাটে" তাহার "পায়ের চিহ্ন" পড়ে না, আজিকার "এই ঘাটে" তাহার "খেয়া-তরী" আর চলে না, "এই হাটে" তাহার আনাগোনাও বন্ধ, তবু সে আছে।

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

আদি কথা

বাড়িটির নাম ঠাকুরবাড়ি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি—এ নাম বাংলা দেশে কে না জানে?

কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ঐ যে ছেলেটি—যে ছেলে আজ শ্যামের গণ্ডি কাটিয়া শ্যামল ধরণীর আলোকে বাতাসে আপনাকে ধরা দিয়াছে, তাহার নাম জানে পৃথিবীর সকলে।

আজ রবীন্দ্রনাথ নাই। ভারতের রবি আজ অস্ত গিয়াছেন—আকাশের রবি দিনের শেষে যেমন যান। আকাশের রবি তাঁহার আলোকমালা সঙ্গে লইয়া যান আমাদের রবিদ্যুতি অম্লান অবিনশ্বর।

আজ সেই প্রদীপ্ত ভাস্করের প্রথম অভ্যুদয়ের কথা স্মরণ করি।

সন ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ সোমবার রাত্রি প্রায় তিনটার সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। কবির জন্মকুণ্ডলীতে জন্মকালের উল্লেখ আছে এইরূপ :

শকাব্দ ১১৮৩।০।২৪।৫৩।০।৮। সন ১২৬৮। ২৫ বৈশাখ। সোমবার : রাত্রি ২-৩৭ মিঃ গতে।[১]

সুতরাং ইংরাজী হিসাবে তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে মঙ্গলবার হইলেও ভারতীয় মতে তাহার আগের দিন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর হইতে ঠাকুর পরিবারে সববিধ অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সামাজিক প্রথার মধ্যে যেখানে যেটুকু শুচিতা ও সৌন্দর্যের অবকাশ আছে তাহা সব ত্যাগ করা হয় নাই। সমাজের প্রতি মহর্ষির একটি সহৃদয় মমত্ববোধ ছিল। সমাজকে তিনি

১ The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, Part II; Sept. 13, 1941

বুদ্ধি দিয়া যতটা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন হৃদয় দিয়া তাহাকে ততটা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ উৎসব ব্রাহ্ম মতে সম্পাদিত হইলেও আনুষ্ঠানিক শোভা ও সৌন্দর্য ব্যাহত হইতে দেন নাই। কবির জ্যেষ্ঠা সহোদরা এই অনুষ্ঠানের যে আংশিক বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখ করি

"রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।"[১]

এই উৎসবের দিনে মহর্ষির নির্দেশে শিশুরবির নামকে বেষ্টন করিয়া যে দীপাবলী প্রজ্বলিত হয় এই বিপুলা ধরিত্রী তাহার অম্লানরশ্মি স্বহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। আলিপনার অবলুপ্ত বর্ণের চারিদিকে প্রদীপের শিখা নির্বাণ লাভ করিয়াছে কিন্তু এই বিশ্বের চিত্রপটে তাহার যে নাম অনপনেয় বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জিত হইয়া রহিল পিতার আশীর্বাদের অনির্বাণ আলোকে তাহার তেজ কখনও মন্দীভূত হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহের নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর।

জোড়াসাঁকোর যে গলির মধ্যে ঠাকুরবাড়ি অবস্থিত বর্তমানে তাহার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। কবির পিতামহের নামেই এই রাস্তার নামকরণ করা হইয়াছে।

তদানীন্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বারকানাথ একটি বিশিষ্ট স্থান

১ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি'; প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় দিবার পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের কথা সংক্ষেপে বলিয়া লই।

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে।
... ...
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।"

যাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও বাহির হইতে তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা না করিয়া পারি না। যেখানে তাঁহাকে খুঁজিতেছি সেখানে যদি কবিকে না-ও পাই তবু মানুষটিকে তো পাইব।—সে-ও কি কম লাভ? আর মানুষটিকে যদি জানিবার সুযোগ ঘটে তো কবিকে জানিবার দুই-একটি সূত্রও মিলিয়া যাইতে পারে।

অন্যান্য মনীষীর কথা বলিতে পারি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে তাঁহার প্রতিভা বৃন্তহীন কুসুমের ন্যায় একান্তভাবে আপনাআপনি ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার পরিচয় শুধু তাঁহারই পরিচয় নয় সমগ্র ঠাকুরবংশের পরিচয়। তাঁহার পিতৃপিতামহের জীবনেতিহাস যে পরিপূর্ণ পরিণামের সুস্পষ্ট সংকেত বহন করিতেছে উষার অনতিপ্রদীপ্ত মহিমার মত তাহাও উপেক্ষণীয় নয়।

ঠাকুরবংশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অর্ধ-বিলুপ্ত অর্ধ-বিস্মৃত যুগের বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয়। কবির পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের যিনি আদিপুরুষ তাঁহার নাম ভট্টনারায়ণ। ইঁহার পুত্রের নাম দীন। ইনি মহারাজ আদিশূরের নিকট হইতে কুশ নামক একটি গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই কুশগ্রাম প্রাপ্তির পর হইতে দীন বংশানুক্রমে 'কুশারী' এই উপাধিতে পরিচিত হইতে থাকেন।

দীন কুশারীর এক বংশধর জগন্নাথ কুশারী যশোহর জেলার দক্ষিণ ডিহির শুকদেব রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। শুকদেব রায়চৌধুরী ছিলেন পীরালী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে জগন্নাথ পীরালী সমাজভুক্ত হন। মতান্তরে তিনি সুধারাম নামক শূদ্ররাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই অসবর্ণ বিবাহের ফলেই জাতিচ্যুত হইয়া পীরালী নামে আখ্যাত হন।[১] জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হইতেই ঠাকুরবংশের উৎপত্তি। পুরুষোত্তমের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মহেশ্বর। ইঁহার পুত্র পঞ্চানন প্রথম গ্রাম ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে গোবিন্দপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। পঞ্চাননের নাম হইতেই ঠাকুর পদবীর সূত্রপাত।

পঞ্চানন যেখানে বাসগৃহ নির্মাণ করিলেন সেখানে জেলে মালো কৈবর্ত প্রভৃতি জাতির কয়েকঘর লোকের বাস ছিল; উচ্চ জাতির লোক বলিতে ছিলেন একমাত্র পঞ্চানন। ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে 'ঠাকুর' বা 'ঠাকুরমশাই' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পঞ্চানন তখন হইতে পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিচিত হইলেন। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীপ্রসঙ্গে জেলে-মালো-কৈবর্ত-পরিবৃত পঞ্চানন ঠাকুরের নাম সশ্রদ্ধ কৌতূহলের সহিত স্মরণ করি।

এই সময় ইংরেজদের জাহাজ আসিয়া গঙ্গার মুখে ঠেকিত। জাহাজে রসদপত্র সরবরাহ করিয়া পঞ্চানন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সহিত পরিচিত

১ "...he married the beautiful and accomplished daughter of Sudha Ram, the Sudra Raja of Esobpore. This inter-marriage is supposed to have cast the Tagores out of the pale of caste and converted them to Peeralies." Kishorichand Mitra, Memoir of Dwarkanath Tagore.

হইয়া উঠিলেন। তাহার ফলে তাঁহার দুই পুত্র জয়রাম ও রামসন্তোষ আমিনি পদ প্রাপ্ত হন; এই কাজে ইঁহারা বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর যখন ইংরেজরা কলিকাতা পুনরধিকার করেন তখন যেস্থানে জয়রামের গৃহ ছিল সেই স্থান ক্রয় করিয়া লন, এবং সেখানেই নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। এই নূতন দুর্গই ফোর্ট উইলিয়ম। ইতিমধ্যে জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নীলমণি তখন পাথুরেঘাটায় আসিয়া নূতন বসতি স্থাপন করেন। পরে ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় পাথুরেঘাটার বাড়ি ছাড়িয়া জোড়াসাঁকোয় বাসগৃহ নির্মাণ করেন। সেই হইতেই ঠাকুরবংশের জোড়াসাঁকোয় বাস আরম্ভ হইল।

নীলমণির তিন পুত্র—রামলোচন রামমণি এবং রামবল্লভ জ্যেষ্ঠ রামলোচনের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে পুত্রক গ্রহণ করেন।

ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষগণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঠাকুরবংশের আদিপুরুষ ছিলেন "বেণীসংহার" গ্রন্থের রচয়িতা। হলায়ুধ, জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, বলরাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ—ইঁহারা সকলেই এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চানন ঠাকুরের সময় হইতেই ঠাকুরবংশে নব ধারার সূত্রপাত হয়। দেশে তখন ফারসীভাষার বিশেষ প্রচলন। পঞ্চাননের পুত্রগণ ফারসীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ বণিকদের সংস্পর্শে আসিবার ফলে ইংরেজী ভাষারও অনুশীলন আরম্ভ হয়। এইরূপে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠাকুরবংশে যে নবযুগের অভ্যুদয় দেখা দিল পঞ্চানন ঠাকুরকেই তাহার প্রথম প্রবর্তক বলা যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

রামলোচন যখন দ্বারকানাথকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন তখন দ্বারকানাথের বয়স পাঁচ বৎসর। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা হয়। প্রথমে গুরুমহাশয়ের নিকট বাংলা তাহার পর মৌলবীর নিকট ফারসী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ফারসীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাও চলিতে থাকে। শেরবোর্ন নামক এক ফিরিঙ্গীর স্কুলে ইংরেজীর প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া দ্বারকানাথ উইলিয়ম আডামস নামক এক পাদরীর নিকট ইংরেজী ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার বুদ্ধি ছিল অতিশয় প্রখর। নিজের চেষ্টায় এবং শিক্ষক গণের সহায়তায় অল্পকাল মধ্যেই ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

তের বৎসর বয়সেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গেই তাঁহার ছাত্রজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে এবং কর্মজীবন আরম্ভ হয়।

প্রথমে তিনি ম্যাকিন্টশ অ্যাণ্ড কোম্পানি নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইয়া ব্যবসায়কার্য ভাল করিয়া শিক্ষা করেন, তাহার পর নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিতে থাকেন।

ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক জমিদারির তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া দ্বারকানাথ আইন শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। তখন আইনজ্ঞ হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার ফার্গুসন সাহেবের বিশেষ খ্যাতি ছিল। দ্বারকানাথ তাঁহার সাহায্যে আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি অচিরকাল মধ্যে আইন বিষয়ে এরূপ

পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, শুধু বাংলা নয় অন্যান্য প্রদেশের জমিদার-গণও তাঁহার নিকট হইতে আইনসংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সরস্বতীর অকৃপণ আশীর্বাদ লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কমলার প্রসন্ন বর লাভেও তিনি বঞ্চিত হইলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য এবং অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বুদ্ধি এবং অনলস কর্মক্ষমতার প্রতি রাজপুরুষগণেরও দৃষ্টি পড়িল। তাহার ফলে তিনি চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ও লবণ বোর্ডের দেওয়ানের পদ ১৮২৩) লাভ করিলেন এবং ছয় বৎসর এই কর্মে নিযুক্ত থাকার পর শুল্ক ও আবগারী বিভাগের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে ম্যাকিণ্টশ কোম্পানির গোমস্তার পদ গ্রহণ করিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ সেই কোম্পানিরই অংশীদার হন। পর বৎসর ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। ৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে কার ঠাকুর কোম্পানি স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই তিনি রাজ-সরকারের চাকরি ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়কর্মে অখণ্ড মনোযোগ দেন। কারঠাকুর কোম্পানির কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকগুলি নীলকুঠিও স্থাপন করেন। রানীগঞ্জের কয়লাখনি এবং রামনগরের চিনির কারখানা পরিচালনাও তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই তাঁহার জমিদারি ছিল। স্বোপার্জিত অর্থেই তিনি রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, হুগলি, যশোর প্রভৃতি জেলায় বহু পরগনা ক্রয় করেন। বঙ্গের বাহিরেও তিনি জমিদারি কিনিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের আমলে যে টাকার তোড়া না গুনিয়া ওজন করিয়া লওয়া হইত বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অতিরঞ্জিত নয়।

দ্বারকানাথ রাজা রামমোহনের ধর্মমত গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু সবপ্রকার সমাজহিতকর কার্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুমার্জিত বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি মনুষ্যত্ব-বিনাশী অন্ধসংস্কারসমূহ বর্জন করেন। সেকালে বাংলাদেশে এমন কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত তিনি কোনও না কোনও ভাবে সংশ্লিষ্ট না ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে যে নূতন ধারার সূত্রপাত হয় তাহার সহিত দ্বারকানাথের নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে।

১৮২৪ সালের মুদ্রাযন্ত্র বিধানের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন, সতীদাহ-প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য রাজা রামমোহনের আন্দোলনে সহযোগিতা করেন, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে নিয়মিত স্টীমার পথ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। হিন্দুকলেজ পুনর্গঠন এবং মেডিকাল কলেজ সংস্থাপনের জন্য শুধু চেষ্টা নয় প্রচুর অর্থসাহায্যও করিয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থসাহায্যে মেডিকাল কলেজের চারিজন বাঙালী ছাত্র বিলাত গিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান।[১]

১৮৪১ সালে দ্বারকানাথ প্রথম ইউরোপে যান। সেই উপলক্ষ্যে কলিকাতার ভারতীয় এবং ইউরোপীয় নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে টাউন হলে একটি সভা আহূত হয়। কলিকাতার শেরিফ উহার সভাপতিত্ব করেন। বিলাতে পৌছিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

সেকালে হিন্দুগণের পক্ষে বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। কেহ বিলাত

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী", ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য

গেলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইত। দ্বারকানাথ কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার মত এই যে, সমুদ্র-যাত্রায় প্রায়শ্চিত্তের বিধানটাই অবৈধ। কেহ বিলাত গেলেই যে সে অপরাধ করিয়া বসিল ইহা মনে করিবারই কোনও হেতু নাই—আর অপরাধ না থাকিলে দণ্ডগ্রহণের সার্থকতা কোথায়?

দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐশ্বর্য যেমন উপার্জন করিয়াছেন, তেমনি ব্যয়ও করিয়াছেন মুক্তহস্তে। তিনি ভোগী পুরুষ ছিলেন, ঐশ্বর্যকে কৃপণের ন্যায় সঞ্চিত রাখা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। জীবনকে তিনি চূড়ান্তভাবে উপভোগ করিয়াছেন। নৃত্য-গীতে উৎসবে-আমোদে যে বিলাসবিভবের বন্যা বহাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া যাইত। বেলগাছিয়া ভিলা ছিল তাঁহার প্রমোদ ভবন। এই বেলগাছিয়া ভিলাকে বহু অর্থব্যয়ে এমন ভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন যে **Memoir of Dwarkanath Tagore** গ্রন্থ প্রণেতা কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহাকে **"the Kensington of Calcutta"** বলিয়া অভিহিত করেন। ইয়ুরোপীয়দের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেশা করিতেন। তাঁহাদের জন্য ভোজের আয়োজন করিয়া, নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করিয়া, পার্টি দিয়া, ডিনার দিয়া যে অর্থব্যয় করিতেন তাহা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। সাহেব-সুবাদের আদর-আপ্যায়নের সবপ্রকার আয়োজনের জন্য এই বেলগাছিয়া ভিলাই নির্দিষ্ট ছিল। লাটসাহেব পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়া এই প্রমোদ-উদ্যানে আসিতেন বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার মাসিক ব্যয় ছিল এক লক্ষ টাকা। বিলাতের লোকেরা তাঁহার এই অকৃপণ ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া তাঁহাকে 'প্রিন্স' এই উপাধি দিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিলাসব্যসনের মধ্য হইতে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়; সে তাঁহার সৌন্দর্যানুরাগ। এই বৃত্তিটি তাঁহার বংশধরদের মধ্যে যেন

উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন :

"যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাহার বেলগাছিয়া বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ভোজনে উৎসবে যে সব আড়ম্বর প্রকাশ পাইত—তাহাই উত্তর কালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে অপরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছিল।"[১]

ইহা ছাড়া সৎকর্মে তাঁহার দানও ছিল অবারিত। কত প্রতিষ্ঠান যে তাঁহারই দানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বলা কঠিন। ব্যক্তিগত দানেরও সীমা পরিসীমা ছিল না।

দুই বৎসর পরে দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান—আর ফিরিয়া আসেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালেই (১লা আগস্ট, ১৮৪৬) তাঁহার মৃত্যু হয়।

শতাব্দী কাল অতীত হইতে চলিল দ্বারকানাথের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার কীর্তিকলাপ ইতিহাসের কুক্ষিগত হইয়াছে। কিন্তু স্থিরদৃষ্টি লইয়া যদি একবার অতীতের দিকে তাকাই তাহা হইলে এখনও দেখিতে পাইব আমাদের জন্য তিনি কি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

"Now what did Dwarkanath leave behind? A Hindu College and a Medical College; the revolting rite of Suttee abolished and branded by law as murder; a Landholders' society representing a most important interest in the country; steam communication; a free press; an uncovenanted judicial service; a subordinate executive service and a better understanding between the Natives and the Europeans."[২]

১ রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড

২ Kishorichand Mitra, "Memoir of Dwarkanath Tagore"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১২২৪ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮১৭ খ্রীঃ ১৫ই মে) তাঁহার জন্ম হয়।[১]

রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পাঠ শেষ করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যবয়সে দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের উপর পিতামহী অলকাদেবীর[২] শুদ্ধাচার ও সাত্ত্বিকতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাজা রামমোহনের সমাজ সংস্কারের ঢেউ তখনও পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করিতে পারে নাই। তখনও পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির ত্রিসীমানায় মদ্যমাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দ্বারকানাথের সম্মান সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। ধনী পিতার ঐশ্বর্য আড়ম্বর হইতে ভোগবিলাস হইতে দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিলেন না। ধন দৌলতের মধ্যে আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তিনি বড় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই ভাবে আঠার বৎসর পর্যন্ত কাটে। এই সময় তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়।

১ "১৭৩৯ শক ৩রা জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা তিথি বৃহস্পতিবার প্রভাতে সূর্যগ্রহণ। সূর্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। কলিকাতায় জোড়াসাঁকো নিবাসী স্বনামখ্যাত ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহে গ্রহবিনাশ উদ্দেশে শান্তিস্বস্ত্যয়নের মহা ধূম। শঙ্খ-ঘণ্টারব, হুলুধ্বনি, হোমদানাদির দ্বারা গৃহপ্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত। সেই সময়ে সেই গ্রহবিপর্যয়কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্ম পরিগ্রহ করিলেন আর অশৌচজনিত সকল প্রকার কর্মানুষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেল।" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, "মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট", পৃঃ ৮৭

২ রামলোচন ঠাকুরের পত্নী

ইহার পর হইতেই তাঁহার মতিগতি একেবারে বদলাইয়া গেল। সংসারের দিকে আর মন রহিল না। সর্বদা ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইল। সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের পুণ্যচরিত্র ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক মহিমোজ্জ্বল নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। দেবেন্দ্রনাথকে যে তাঁহার ভক্ত এবং শিষ্যগণ মহর্ষি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন তাহা ভক্তির অত্যুক্তি নয়।

শৈশবে অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একদিন তিনি যাহার আভাস পাইয়াছিলেন, ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্র সেই অনন্ত অসীম ঈশ্বরেরই পরিচয় বহন করিয়া আনিয়া জীবনপথ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিল।

> ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।

উপনিষদের এই মন্ত্র তাঁহার জীবনের মন্ত্র হইয়া উঠিল।

বাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন।[১] ঐ সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র সূচনাও তিনিই করেন। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম তাঁহারই চেষ্টায় নবরূপ পাইল। ধর্মসম্বন্ধে তিনি নানা পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ব্রাহ্মধর্ম" একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী" তাঁহার ধর্ম-জীবনের একটি অপূর্ব ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ।

মহর্ষির ধর্মভাব কেবলমাত্র বাহিরের জিনিস ছিল না। তাঁহার সমস্ত

১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, "মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট", পৃ: ৮৯

চৈতন্য, জীবনের সমস্ত সাধনা, সংসারের সকল কর্মের সহিত ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল। তাঁহার চরিত্রে যে স্বভাব ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাই—এই ধর্মভাব হইতেই তাহার জন্ম হয়। দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে তাঁহার ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় এক কোটি টাকারও অধিক। আইনত এই ঋণের জন্য কেহই দেবেন্দ্রনাথকে দায়ী করিতে পারিত না। দ্বারকানাথ deed of settlement এ অধিকাংশ সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ট্রাস্টী নিযুক্ত করিয়া যান। সুতরাং উত্তমর্ণকে ফাঁকি দেওয়া তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণের সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। এই ঋণ শোধের জন্য তাঁহাকে যে দুঃখ স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হইত না। বস্তুত ইহা তাঁহার অসামান্যতার একটি নিদর্শন।

দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়নিষ্ঠার সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবন-স্মৃতি" প্রবন্ধ হইতে একটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করিতেছি :

"কলিকাতায় আমার বড়দিদিমার একখানা বাড়ি ছিল। দিদিমার এক পালিত কন্যামাত্র ছিল। পিতৃদেব ছাড়া তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধি-কারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ীর স্বত্ব আমার পিতৃদেবে আসিয়া বর্তিল। সেই বাড়ি দখল করিবার কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই বাড়ির উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বাড়িটি বেশ বড়। মূল্য ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু পিতৃদেব ঐ বাড়ি দিদিমার পালিত কন্যাকেই দান করিলেন।"[১]

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮

পিতামহীর মৃত্যুদিন হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। এত ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে মানুষ হইয়াও হঠাৎ এমন তরুণ বয়সে এমন বৈরাগ্য কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় যেন অগ্নি ছিল ভস্মে ঢাকা। বাহির হইতে তাহার দীপ্তি দৃষ্ট হয় নাই, উত্তাপ অনুভূত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া যেই ছাই-গুলি উড়াইয়া লইয়া গেল, আগুন আর ঢাকা রহিল না।

বৈরাগ্যোদয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া বলিলেন, "আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিব।"

আর কেহ কিছু চাহিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেঠতুত ভাই ব্রজ-বাবু বলিলেন, "আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দিন, ঐ ছবিগুলান দিন, ঐ জরির পোষাক দিন।"[১]

অমনি দেবেন্দ্রনাথ সেগুলি দিয়া দিলেন।

১ মহর্ষির "আত্মজীবনীতে" এইরূপই আছে। কিন্তু "ঘরোয়া"য় আছে, অনেকেই কিছু কিছু চাহিয়াছিলেন। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের শোনা কথা।

"ঈশ্বর বাবু (ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়) গল্প করতেন, একবার যখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে, চারদিকে ধার, কর্তামশায়ের (দেবেন্দ্রনাথের) শখ হল, কল্পতরু হব। রব পড়ে গেল বাড়িতে কর্তা দাদামশায় কল্পতরু হবেন। কল্পতরু আবার কী। কী ব্যাপার! সারা বাড়ির লোক এসে ওঁর সামনে জড়ো হল। উনি বললেন ঘর থেকে যার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কেউ নিলে ঘড়ি, ন পিসিমা নিলেন আয়না না কী একটা, কেউ নিলেন টেবিল, ছোটো পিসিমাও নিলেন কিছু একটা—যে যা পারলেন নিয়ে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ঘরটা খালি হয়ে গেল। সবাই চলে গেলেন। ঈশ্বর বাবু বললেন, বুঝলে ভাই তোমার কর্তা দাদামশায় তো কল্পতরু হয়ে খালি ঘরে এক বেতের চৌকির উপর বসে রইলেন।"

সে সময় তাঁহার মনের অবস্থা এমনই যে তিনি সুবিধা পাইলেই দুপুরবেলা একলা বটানিকাল গার্ডেনে চলিয়া যাইতেন। জায়গাটি নির্জন বলিয়া তাঁহার খুব ভাল লাগিত। তিনি সেখানে বসিয়া মনে মনে ভগবানের কথা চিন্তা করিতেন। একদিন একলা বসিয়া বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া একটি গান বাহির হইল :

"হবে কি হবে দিবা আলোকে,
জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।"

এই তাহার প্রথম গান। তিনি সেই নির্জন বাগানে বসিয়া গলা ছাড়িয়া এই গান গাহিতেন।

মহর্ষির নিজের রচিত গভীর জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি-উদ্দীপক অনেক গান আছে। শুধু বাংলা নয় সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি গান রচনা করিতেন। এইরূপ একটি গানের নিদর্শন এখানে দেওয়া হইল :

"তং পরং পরমেশ্বরং
অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং
বয়ং স্মরাম হে বয়ং ভজাম হে
কারণং জনগণমানসপরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।
অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে,
মহতোস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি।
বয়ং স্মরাম হে বয়ং ভজাম হে
পরমং জনগণমানসপরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।" [১]

বাল্যকালে তাঁহার অনেক রকমের শখ ছিল। তাহার মধ্যে একটি হইল পায়রা পোষা। এই শখের একজন সাকরেদ ছিলেন তাঁহার

১ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, "মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট", পৃঃ ১০

ভাগনে ঈশ্বর মুখুজ্যে। মামা ভাগনের বয়স ছিল প্রায় সমান। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে দুজনে টেরিটি বাজারে গিয়া ভাল ভাল পায়রা কিনিয়া আনিতেন।

তাঁহার আর এক শখ ছিল—গান বাজনা। ছেলেবেলা সাহেব মাস্টারের কাছে তিনি পিয়ানো শিখিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি বাডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া ওস্তাদ রাখিয়া কালোয়াতি গান বাজনা শিখিতেন। তবে গায়ক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল না। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠে মন্ত্র আবৃত্তি যে শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সংগীতের চর্চা ঠাকুরবাড়ির একটা বিশেষত্ব। ইহার জন্য অর্থব্যয়ের অবধি ছিল না।

বিশুদ্ধ সংগীতের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। এইজন্য গায়ক বাদককে তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। তিনি কখনও কখনও সন্ধ্যার পর বিষ্ণুর গান শুনিতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়িতে মাসিক বেতন পাইতেন। তথাপি মহর্ষি যখনই তাঁহার গান শুনিতেন তখনই তাঁহাকে কিছু পারিতোষিক দিতেন। তিনি সেকালের ভাল ভাল গায়ককে বাড়িতে আনিয়া রাখিতেন।[১]

১ "বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রানাঘাট অঞ্চলের 'আন্দুল কায়েতপাড়া' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী। কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ ও বিষ্ণুচন্দ্র সংগীতশিক্ষার্থ মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্বেই দয়ানাথ দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রথম দিবসাবধি কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তাহার গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। তখন হইতে একা বিষ্ণুই আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কার্য করিতেন…এক সময়ে বিষ্ণুর গীতের জন্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের নাম চতুর্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল।…বিষ্ণুচন্দ্র এগারো বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আটাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত, সাতষট্টি বৎসর কাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কাজ করেন।" সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী", ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩১৪

ছেলেরা যখন বিষ্ণু এবং অন্যান্য ওস্তাদদের গান ভাঙিয়া ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তখন মহর্ষি সেই গান শুনিয়া পুত্রদের উৎসাহ দিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবার একটি সংগীত-সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ করেন। সেই সমাজে বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চা হইবে শুনিয়া তিনি পুত্রকে ১০০০্ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিতে অনুমতি করেন।[১]

মানুষের জীবনে আমোদ আহ্লাদের যে একান্ত প্রয়োজন আছে তাহা তিনি অনুভব করিতেন। আনন্দবর্জিত সংসারবিমুখ বৈরাগ্য যে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে তাঁহার জীবনে এই সত্যটিরই প্রতিষ্ঠা দেখি। গীতবাদ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। নাট্যাভিনয়ে তিনি উৎসাহ দিতেন। আমাদের দেশে নির্দোষ আমোদের অভাব অনুভব করিয়া সংগীত এবং অভিনয়ের অনুষ্ঠানে তিনি আনুকূল্য প্রকাশ করিতেন। তবে এই সমস্ত আমোদ সহজেই দোষে পরিণত হইতে পারে এ আশঙ্কা তাঁহার ছিল। এখানে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে রাম-নারায়ণ তর্করত্নের "নবনাটক" প্রথম অভিনীত হয়। মহর্ষি তখন নাটোরে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি এই উপলক্ষে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথকে লিখেন :

> "প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ, তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে।……কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই।"

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃঃ ৩৮৮

ঠাকুরবাড়ির শৌখিনতার সঙ্গে সুরুচি ও সৌন্দর্যের যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে সেটা সকলের দৃষ্টিতে পড়ে না। তাই এই শৌখিনতাকে নিছক বিলাসিতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তো চিরকালই ধনীর দুলাল ছিলেন না। একদিন তো পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি অধ্যাত্মপথের পথিক হইয়াছিলেন, জীবনে এমন দিনও তো আসিয়াছিল যেদিন সমগ্র দেশ তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু সেদিনও তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয়তা মন্দীভূত হয় নাই। অন্তরের যে শুচিতা তাঁহার মুখে চোখে সব অবয়বে একটি সুনির্মল দিব্য জ্যোতির আকারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িত, বাহিরেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না।

বাড়ির ছেলেরা তাই তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহস পাইত না। কখনও তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইলেও হাত পা ভাল করিয়া ধুইয়া পরিধেয় পরিচ্ছদ সুবিন্যস্ত করিয়া তবে তাঁহার কাছে যাইত। কোনও রকমের অপরিচ্ছন্নতা, নিয়মের কোনো ত্রুটি, পোশাক পরিচ্ছদের কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

মহর্ষির পরিচ্ছন্নতাবোধ ছিল তীব্র রকমের। তিনি নিজে সর্বদাই পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, তাঁহার সাজ সজ্জায় কখনও কিছুমাত্র মলিনতা থাকিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এই যে শুচিতা এ তো শুধু বাহিরের নয়, তাঁহার অন্তরের অকলঙ্ক নির্মলতার সহিত ইহার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। পুত্রের চরিত্রেও সেই শুচিতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে পিতার প্রভাব অল্প নয়। পিতার বহু গুণ তিনি যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করিয়াছিলেন।

পিতাপুত্র

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় খুব অল্পই থাকিতেন, প্রবাসেই বেশীর ভাগ দিন কাটিত। কলিকাতায় যখন আসিতেন তখনও বাড়ির ছেলেরা তাঁহার কাছে বড় একটা যাইতে পাইত না।

বাবাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কাছে যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু দূরে দূরে থাকিয়াই সে সাধ মিটাইতে হইত।

একবার মহর্ষি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, কলিকাতায় হঠাৎ সংবাদ রটিয়া গেল, রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে।

মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একটা চিঠি লেখো তো!"

রবীন্দ্রনাথ বড় হইয়া অনেক চিঠি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ যখনকার কথা চিঠি লেখার নিয়মকানুন তখনও তাঁহার শেখা হয় নাই।

দফ্‌তরখানায় এক মুনশী ছিলেন, তাঁহার নাম মহানন্দ। ইঁহার সাদা চুল, সাদা লম্বা দাড়ি। একতলার কাছারি ঘরে বসিয়া পিঠের কাছে তাকিয়া রাখিয়া হিসাব নিকাশ করিতেন। এক হাতে কলম চলিত আর একহাতে চলিত তালপাতার পাখা।[১] বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহানন্দর উপদেশমত চিঠি লেখা হইল।

১ এই মহানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় মুখে মুখে কয়েকটি ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ "ঘরোয়া"য় তাহার সামান্য কিছু স্মৃতি হইতে বলিয়াছেন :

"মহানন্দ নামে এ কাছারিধামে
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।"

সে চিঠির উত্তর আসিল। উত্তরে বাবা লিখিলেন, রাশিয়ানদের ভয করিবার কারণ নাই। তিনি আসিয়া নিজে তাহাদের তাড়াইযা দিবেন।

বাবার কাছ হইতে চিঠির উত্তর পাওয়ায ছেলের ভয ভাঙিযা গেল। তিনি সেই হইতে প্রতিদিন একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সে চিঠি যে ঠিক জাযগায় যাইত না পত্রপ্রেরক তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিবার মত বয়স তাঁহার ছিল না। চিঠি পাঠাইতে হইলে যে ডাকটিকিট লাগাইতে হয, তাহার পয়সা কোথা? লেখক পত্র লিখিয়াই মহানন্দের হাতে সমর্পণ করিতেন, আর ভাবিতেন কাজ চুকিয়া গেল।

কাজ সত্যই চুকিয়া যাইত। ছেলেমানুষের চিঠিতে টিকিট আঁটা—মহানন্দের মত হিসাবী লোক এমন বেহিসাবী কাজ করিবেন কেন?

হায়, আজ যদি সেই দফতরখানা থাকিত তো কাঁচা হাতের সেই পুরাতন চিঠিগুলির খোঁজ করিয়া দেখিতাম কি কথা তাহাতে লেখা ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহসির কাজকর্মের মধ্যে কোথাও কোনও অনিয়ম থাকিতে পাইত না। ঢিলাঢালা এলোমেলো ভাব তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সর্বক্ষেত্রেই নিয়মের বাঁধন এমন

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, সোমেন্দ্রনাথ এই ছড়াটি প্রায়ই আওড়াইতেন। আর একটি ছড়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, এমন কি চারি চরণও সম্পূর্ণ তোলা হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের যতটুকু মনে ছিল ততটুই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে মহানন্দের জীবন চরিতের অংশবিশেষ জনসাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে:

"হস্তেতে ব্যজনী ন্যস্ত
মশামাছি ব্যতিব্যস্ত
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস—"

ভাবে বাঁধিতেন যে, কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকিতে দিতেন না। কিন্তু বালকের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে যে অবাধ স্বাধীনতার আবশ্যক তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই। স্বাধীনতা যাহাতে স্বেচ্ছাচারের পথে ভ্রষ্ট করিয়া না দেয় এই জন্যই সংযম-শিক্ষা প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে যে নিয়মানুগত্য দেখিতে পাই তাহা স্বাধীনতাসম্ভোগের সোপানস্বরূপ।

১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসর নয় মাস। উপনয়নের পর মহর্ষি তাঁহাকে বোলপুরে লইয়া যান।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করেন। তাহার পর সেখানে একটি একতলা বাড়ি তৈয়ার করা হয়। দেবেন্দ্র-নাথ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যেও কেহ কেহ আসিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিতেন। এই নির্জন স্থানটিকে মহর্ষি স্বীয় সাধনার ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন। সপ্তপর্ণিতলে মহর্ষির সাধনবেদী এখনও বর্তমান আছে।

আজিকার সুরম্য শান্তিনিকেতন দেখিয়া সেদিনকার আশ্রমের কল্পনা করা যায় না। বীরভূমের লাল মাটি। খটখটে শুকনো পাথুরে প্রান্তর। গাছপালা নাই—যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিক শুধু ধু ধু করিতেছে। তৃণহীন কঙ্করাকীর্ণ মাঠের বুকে খাদ কাটিয়া বর্ষাকালে জলধারা বহিয়া যায়। এই খাদবহুল লাল কঙ্করময় বন্ধুর প্রান্তরকে স্থানীয় লোকে খোয়াই বলে। বালক রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে অবস্থানকালে এই খোয়াইয়ের ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকমের পাথর কুড়াইয়া জামার আঁচল বোঝাই করিতেন।

পাথরের নুড়ি এমন কিছু দামী সম্পত্তি নয়, কিন্তু শিশুর মন সাংসারিক

প্রয়োজনের হিসাব করিয়া সব জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে না। দেবেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতেন, তাই তিনি পুত্রের কৌতূহলে বাধা দিতেন না। পুত্র যখন পিতার কাছে তাঁহার কুড়ান নুড়িগুলি আনিয়া উপস্থিত করিতেন মহর্ষি কখনও তাঁহার অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। বরং ছেলের কাজে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "কী চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে?"

পিতার উৎসাহবাক্যে বালকের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "এমন আরও কত আছে। কত হাজার হাজার। আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।"

যাঁহাদের বয়স বেশী তাঁহারা বালকের খেলাকে গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু মহর্ষির প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ এবং ছেলেখেলাকে ছেলেখেলা বলিয়া তিনি কখনও অগ্রাহ্য করেন নাই।

একবার খোয়াইয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে বালক রবীন্দ্রনাথ একটি গর্ত দেখিতে পাইলেন। গর্তটি জলে পূর্ণ। মাটির জল চোয়াইয়া চোয়াইয়া গর্তটি ভরিয়াছে। ভরিয়া জল উপছাইয়া পড়িতেছে। সেই জল গর্তের এক ধার দিয়া বালির মধ্যে রেখা আঁকিয়া ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে। পুত্র আসিয়া পিতার কাছে জানাইলেন, "ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে আমাদের স্নানের ও পানের জল আনিলে বেশ হয়।"

মহর্ষি বলিলেন, "তাই তো সে তো বেশ হইবে।" শুধু বলিলেন নয়, সত্য সত্যই সেখান হইতে জল আনা হইল।

ছেলেবেলা হইতেই দায়িত্ব লইয়া কাজ করিবার শিক্ষা সকলের হয় না। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে এই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি

এগার বার বৎসরের বালকের হাতে দুই চারি আনা পয়সা দিয়া তাহার হিসাব রাখিতে বলিতেন

মহর্ষির একটি দামী সোনার ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িটিতে প্রতিদিন দম দিবার ভার দিলেন ছেলের উপর। সে ভার কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই বলি

"তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।"

বালকের হাতে দামী ঘড়ি দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তাহা যে তিনি বুঝিতেন না এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু ছেলেকে দায়িত্বে দীক্ষিত করিবার জন্য সে ক্ষতিকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন।

শুধু সাবধানতা নয় সমবেদনাবৃত্তি জাগরিত করিবার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি যখন পুত্রকে লইয়া পথে বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন ভিক্ষুক দেখিলে পুত্রের হাত দিয়া ভিক্ষা দেওয়াইতেন।

বোলপুরে কিছুদিন অবস্থানের পর পিতাপুত্র সেখান হইতে অমৃতসর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে সাহেবগঞ্জ দানাপুর এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে উভয়ে অমৃতসরে পৌঁছিলেন।

এই যাত্রাপথের একটি ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিলে টিকিটপরীক্ষক আসিয়া তাঁহাদের টিকিট দেখিল। রবীন্দ্রনাথের তখনও বার বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার জন্য পুরা টিকিট না করিয়া হাফ টিকিট কাটা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য শৈশব হইতেই খুব ভাল। তাঁহার দেহের বৃদ্ধি বয়সের অনুপাতে একটু বেশীই দেখাইত। তাই টিকিটপরীক্ষকের সন্দেহ হইল,

কিন্তু সন্দেহ হইলেও সে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একজনকে সঙ্গে করিয়া আনিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর আরোহীকে কিছু বলিবার ভরসা তাহারও হইল না। তৃতীয়বারে সম্ভবত স্টেশন-মাস্টারই নিজে আসিলেন। স্টেশনমাস্টার আসিয়া টিকিট দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সঙ্গের বালকটির বয়স কি বার বৎসরের বেশী নয়? দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, না। ইহাতেও বিশ্বাস না করিয়া স্টেশনমাস্টার বলিলেন, এই বালকের জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে নোট বাহির করিয়া দিলেন এবং স্টেশনমাস্টার ভাড়ার টাকা লইয়া বাকী টাকা যখন ফেরত দিলেন তিনি সে টাকা প্লাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তিনি যে কয়েকটা টাকা বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না স্টেশনমাস্টার পূর্বে না বুঝিলেও পরে নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন।

অমৃতসরে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত পদব্রজে শিখমন্দির গুরুদরবারে যাইতেন। সেখানে নিয়তই ভজন চলিত। মহর্ষি শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া মাঝে মাঝে ভজনায় যোগ দিতেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ গুরুদরবারের এক গায়ককে বাসায় আনিয়া গান শুনেন। গান শুনিয়া তাহাকে কিছু মুক্তহস্তেই পুরস্কৃত করেন। তাহার ফলে গান শুনাইবার জন্য প্রতিদিনই গায়কের দল ভীষণ ভিড় করিতে আরম্ভ করিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইল। বাড়িতে আসার পথ যখন বন্ধ হইল তখন তাহারা রাস্তার মধ্যে আক্রমণ শুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"প্রতিদিন সকালবেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে

বাহির হইতেন। এই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরা ঘাড়ে গায়কের আবির্ভাব হইত। যে পাখির কাছে শিকারি অপরিচিত নহে সে যেমন কাহারও ঘাড়ে বন্দুকের চোঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে, রাস্তায় সুদূর কোনো একটা কোণে তানপুরা যন্ত্রের ডগাটা দেখিলেই আমাদের সেই দশা হইত।"

'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নামক ক্ষুদ্র নাটিকায় দুকড়ি দত্তের দুরবস্থার কথা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসে। এই কৌতুকনাটিকা রচনাকালে বাল্যের স্মৃতি সম্ভবত কিছু অংশগ্রহণ করিয়া থাকিবে।

অমৃতসরে তাঁহারা মাসখানেক মাত্র থাকিয়া ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করেন। সেখানে কয়েক মাস কাটিলে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

ভ্রমণের এই কযেক মাসে পড়াশোনার নূতনতর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সময়কার প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল ইংরেজী ও সংস্কৃত। বক্রোটা হইতে দেবেন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেন:

> "রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজী অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্মও পড়াইযা থাকি।" [১]

পুত্রের শিক্ষার জন্য দেবেন্দ্রনাথ পিটার পার্লিজ টেল্‌স্‌ পর্যায়ের কয়েকটি বই লইয়া গিযাছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি পুত্রের পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনীগ্রন্থ অনেকটা গল্পের মত হইবে। তাহা পড়িলে পুত্রের উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিনের হিসাব করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা দেবেন্দ্রনাথকে পীড়িত করিত এবং

১ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র, ২৫ এপ্রিল, ১৮৭৩

ঐ পুস্তকের স্থানে স্থানে ফ্রাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার যে সব দৃষ্টান্ত ও উপদেশবাক্য দেওয়া আছে তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। এ বই যে বালকের মন টানিতে পারিবে না তাহা তিনি পড়াইতে গিয়া বুঝিতে পারেন।

পাহাড়ে থাকিতে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই মহর্ষি পুত্রকে জাগাইয়া দিতেন। ভোরে উঠিয়াই উপক্রমণিকা পড়িতে হইত। কবি বলিয়াছেন :

"তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্বোধন।"

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া একবার উপাসনা করিতেন। পুত্রের সংস্কৃত পাঠের পর আবার তাঁহাকে লইয়া আর একবার মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনার শেষে ভ্রমণের সময় নির্দিষ্ট ছিল। বালকপুত্র পিতার সহিত বেশী দূর হাঁটিতে পারিতেন না। তিনি কিছুদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিতেন। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরাজী পড়া চলিত।

এই কয়েক মাসে উপক্রমণিকা ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল। উপক্রমণিকা হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করা চলিতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগও পড়া আরম্ভ হইল। বাংলাভাষা বাল্যকালে ভাল করিয়া পড়া থাকায় সংস্কৃত শিক্ষা বিশেষ কঠিন বোধ হইত না। আধুনিক কালের শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অনেক সময় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। দেবেন্দ্রনাথও তাহাই করিতেন। তিনি পুত্রকে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে বলিতেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :

"একেবারে গোড়া হইতে যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দ-গুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বর যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।"

এতদ্ব্যতীত বালক রবীন্দ্রনাথের আর একটি শিক্ষার বিষয় ছিল—জ্যোতিষ। দেবেন্দ্রনাথ প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে পুত্রকে বুঝাইয়া দিতেন; বালক তাহা বাংলায় লিখিয়া লইতেন।

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে :

"এই সময়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাঁহার বাংলা গদ্য-রচনার সূত্রপাত।"[১]

পিতার কাছে জ্যোতিষ শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রংকানা

১ এস্থলে প্রাসঙ্গিক বোধে উল্লেখ করিতেছি যে, দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য পুত্রকেও শিক্ষা দিতেন।

"যখনই বাড়ি আসিতেন তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) আমাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। তাঁহার তেতালার বসিবার ঘরে, দিনকতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিক মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮

আমি তেমনি তারিখকানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো)[১] পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।"[২]

পিতার মুখে শোনা জ্যোতিষের বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি একটি বৃহৎ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।"[৩]

এই প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠমাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না।[৪] জীবনস্মৃতিতে যখন

১ উপনয়নের সময় তাঁহার বয়স এগার বৎসর নয় মাস। উপনয়নের পরই হিমালয়-যাত্রা করেন। হিমালয় হইতে ফিরেন চার পাঁচ মাস পরে। তখন তাঁহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া দুই এক মাস হইবে।

২ "বিশ্বপরিচয়"

৩ "বিশ্বপরিচয়"

৪ রবীন্দ্রনাথ এককালে বহু রচনা অ-নামে এবং বেনামে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ছদ্মনামগুলি ছিল কৌতুকমিশ্রিত, যেমন—দিকশূন্য ভট্টাচার্য, অকপটচন্দ্র ভাস্কর। শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য

তিনি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর-সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' নামক সমালোচনা প্রবন্ধকে প্রথম গদ্য রচনা বলেন তখন সম্ভবত বাল্যকালের এই রচনার কথা তাহার মনে ছিল না। বস্তুত এই প্রবন্ধই যে তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা সে সম্বন্ধে মতান্তরের কারণ দেখি না।

যাহাই হউক সকাল সন্ধ্যায় সংস্কৃত ইংরেজী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষাতেই কর্তব্য সমাপ্ত হইত না। দুপুরবেলাও আহারের পর মহর্ষি আর একবার পুত্রকে পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে সময় এমনি ঘুম আসিত যে পড়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। তাহা দেখিয়া পিতা ছুটি দিয়া দিতেন। তখন ঘুমও পলাইত।

এতকাল কবি দূর হইতেই প্রকৃতির আরাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন; সেই প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইয়া তাঁহার নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া গেল। যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেন দেখিতেন পর্বতের উপত্যকায় অধিত্যকায় নানাবিধ চৈতালী ফসল সোনার রঙে রঞ্জিত হইয়া আছে। দেখিতেন পাহাড়ের কোনো কোণে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতিসমূহ ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদেরই কোলের কাছ দিয়া শৈবালময় কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঝরনাধারা বহিয়া যাইতেছে। এ সব দৃশ্য ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মন সরিত না।

বক্রোটায় তাঁহাদের বাসা ছিল একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। বৈশাখ মাস হইলেও সেখানে তখন প্রচণ্ড শীত। পথের অনেক জায়গায় তখনও বরফ গলে নাই।

এই তুষারাচ্ছন্ন পার্বত্যপথ যে বালকের পক্ষে খুব সুগম ছিল তাহা নয় কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ আপনমনে ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পিতা কখনও বিপদ আশঙ্কা করিয়া বাধা দেন নাই। তাঁহাদের বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকায় এক বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে বালক রবীন্দ্রনাথ

একটা লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতেন। এক একদিন দুপুরবেলা লাঠি হাতে এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতেন। দেবেন্দ্রনাথ কখনও উদ্বেগ প্রকাশ করেন নাই। পুত্রের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ করিলেও তিনি শাসন করিয়া নিবারণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন .

"যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্য-স্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।"

পিতার সহিত এই কয়মাসের একত্র সহবাস তাঁহার জীবনে নব যুগের সূচনা করে। তাঁহার রচনার মধ্যেও ইহার প্রভাব পড়িয়াছিল। তিনি নিজেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন :

"তাঁহার (মাতার) মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্বে আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃতসর হইয়া ড্যালহৌসি পর্বতে ভ্রমণ করিতে যান—সেই আমার বাহিরের জগতের সহিত প্রথম পরিচয়। সেই ভ্রমণটি আমার রচনার মধ্যে নিঃসন্দেহ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"[১]

১ ১৩১৭ সনের ২৮শে ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রের অন্তর্গত আত্মজীবনী

জননী সারদাসুন্দরী

রবীন্দ্রনাথ জীবনে মায়ের সান্নিধ্য তেমন ঘনিষ্ঠ করিয়া পান নাই। তাঁহার সুবিশাল সাহিত্যের মধ্যেও মায়ের কথা অল্প।

অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"সাত সাত ছেলে কর্তাদিদিমার (সারদাসুন্দরীর)—তাঁকে বলা হত রত্নাগর্ভা। কর্তাদিদিমার সব ছেলেরাই কী সুন্দর আর কী রং—তাদের মধ্যে রবিকাকা হচ্ছেন কালো। কর্তাদিদিমা খুব কষে তাঁকে রূপটান সর ময়দা মাখাতেন।"

এই বর্ণসংস্কারের কথা কবি নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন। শৈশবে ভোরে উঠিয়া রবীন্দ্রনাথ কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়িতেন। একে কালো ছেলে তাহার উপর প্রতিদিন মাটি মাখিলে রং আরও কালো হইয়া যাইবে মায়ের মনে এই ভয় ছিল তাই তিনি ছুটির দিনে নিজেদের হাতে তৈয়ারি প্রলেপ দিয়া পুত্রের বর্ণশোধনে মন দিতেন।

"সকাল বেলায় রোজ এত করে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের। তাঁর ভয় হত ছেলের রং মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে।"

শৈশবে ভৃত্যদের অধীনেই কবির দিন কাটিয়াছে। শুইবার সময় ছাড়া অন্তঃপুরে যাওয়া আসারও সুযোগ কম মিলিত। কাজেই মায়ের কাছাকাছি থাকার সুবিধা বেশী হয় নাই।

কনিষ্ঠপুত্রের রং সম্বন্ধে মাতার যে ধারণাই থাক, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উচ্চই ছিল। বালকপুত্র নিজের চেষ্টাতেই সে ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মাতার সান্ধ্যসভায় স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য বালকের আগ্রহ কিছু অধিক পরিমাণেই ছিল। নর্মালস্কুলে পড়িবার সময় পাঠ্যপুস্তকে নূতন কোনও বিষয় শিক্ষা করিলেই মাতাকে তাহা শুনাইয়া বালক রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা আদায় করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"যেদিন কোনো একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষ গুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়।"

যে ব্যাকরণ তাঁহার পাঠ্য ছিল তাহারই কাব্যালংকার অংশে কতকগুলি কবিতা উদাহরণস্বরূপে দেওয়া ছিল। সেই কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়া বালক মাতাকে বিস্মিত করিয়া দিতেন। এইরূপ একটি কবিতা জীবন-স্মৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে :

"ওরে আমার মাছি।
আহা কী নম্রতা ধর এসে হাত জোড় কর
কিন্তু কেন বার কর তীক্ষ্ণ শুঁড়গাছি।"

হিমালয় ভ্রমণকালে মহর্ষি প্রক্টরের জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক বিষয় মুখে মুখে শিখাইতেন। গ্রহতারকা সম্বন্ধে এইরূপে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তাহাও মায়ের কাছে বিবৃত করিতেন।

ঋজুপাঠে মূল বাল্মীকি-রামায়ণের কিয়দংশ উদ্ধৃত ছিল। পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। সে সংবাদটাও তিনি মাতার কাছে বিশেষ উৎসাহ সহকারে প্রচার করেন। এই সংবাদটাতেই মাতা সব চেয়ে বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালের সেই স্মৃতি পরিণত বয়সেও তাঁহার মনে অম্লানরূপেই বিদ্যমান ছিল। এইরূপ আত্মপ্রচারের

সুগম পথে এক-একদিন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইত। এইরূপ একটি দুর্ঘটনার কথা কবি "জীবনস্মৃতি"তে রহস্যচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"পৃথিবীসুদ্ধ লোকে বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায় আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি'।

"হায়, একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন তাঁহাকে 'ভুলিয়া গেছি' বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। সুতরাং ঋজুপাঠ হইতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জস্য রহিয়া গেল।"

মায়ের সভায় বাল্মীকি-রামায়ণের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়, কারণ সেখানে ধরা পড়িবার আশঙ্কা কম। কিন্তু খ্যাতি যখন আসে তখন কিছু বিড়ম্বনাও সঙ্গে আনে। সে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধ বয়সে নয় বাল্যকাল হইতেই তিনি লাভ করিতেছিলেন। কবি লিখিতেছেন :

"স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে মার্জনা করিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি

দিলেন না। মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন, 'একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি'।"

কবি মনে মনে বিপদ গনিলেন। মায়ের কাছে যত সহজে বিদ্যাবত্তা প্রচার করা চলে বড়দাদার কাছে তত সহজে চলিবে না তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং তিনি নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া বিপদ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মাতা তাঁহার কথায় কান না দিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্নেহশীলা মাতা পুত্রের কৃতিত্বের গৌরব সকলের কাছে ঘোষণা করিবার জন্য যতই ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন পুত্রের মনও ততই আশঙ্কায় সংকুচিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বড়দাদার একটি আঘাতে সযত্নে রচিত অহংকারের এতবড় প্রাসাদটি হয়তো বা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যাহাই হউক দ্বিজেন্দ্রনাথ আসিলেন এবং তাঁহার কাছে রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেও হইল। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনও একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের পঠিত গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই বেশ হইয়াছে বলিয়া চলিয়া গেলেন। "দয়ালু মধুসূদন তাঁহার দর্পহারিত্বের একটু আভাস মাত্র দিয়া ··· এ যাত্রা ছাড়িয়া দিলেন।" মায়ের কাছে অর্জিত খ্যাতি কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না।

মহর্ষির অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের কাছে বালক কবি অনেক পাঁচালির গান শিখিয়াছিলেন। মাতা বালকপুত্রের মুখে সেই গানগুলি শুনিয়া খুব প্রীত হইতেন। কবি লিখিয়াছেন :

> "এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

রবীন্দ্রজননীর জীবনকথার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত অতি সংক্ষিপ্ত যে দুই চারিটি তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহা জীবন-চরিত প্রণয়নের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অপ্রচুর।

সারদাসুন্দরী ছিলেন যশোরের মেয়ে। তখন ঠাকুরবাড়িতে যশোরের মেয়েই বেশীর ভাগ আসিতেন। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীও ছিলেন যশোরের মেয়ে।

পিত্রালয়ে লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা হয় নাই। আর ছয় বৎসর তো বয়স সুতরাং শিখিবার অবসরই বা কোথায়? তবে ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া বৈষ্ণব মেয়েদের কাছে বাংলা লেখাপড়া কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

> "আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা এমন কি সংস্কৃত শিক্ষা করিত—তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং সেকেলে দুই একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই তখন যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা কাকীমারাও সেইরূপ শিক্ষাই পাইয়াছিলেন।" [১]

সারদাসুন্দরীর বিবাহ হয় ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তখন তিনি ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি যখন শ্বশুরালয়ে প্রথম পদার্পণ করেন ঠাকুরবাড়ির ঐশ্বর্য-আড়ম্বরে তখনও ভাঁটা পড়ে নাই। প্রচুর ভোগবিলাসের মধ্যে তাঁহার বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই সুখৈশ্বর্যের দিন যে তাঁহার জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয় ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। পিতার সুবিপুল ঋণভার স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ সাংসারিক দুঃখকষ্টকে

১ 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

স্বচ্ছন্দমনে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। মহদাশয় স্বামীর সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টায় তাঁহার ঐকান্তিক সহযোগিতা না থাকিলে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইত কি না কে বলিবে?

শুধু সংসারে নয় ধর্মকার্যেও তিনি মহর্ষির প্রকৃত সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহার ধর্মসাধনার পথেও এই পতিব্রতা রমণী কখনও বাধার সৃষ্টি করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার পিতা দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। মাঝে মাঝে কখনও বাড়ি ফিরিতেন আবার কয়েকদিন থাকিয়াই চলিয়া যাইতেন। একথা কবি জীবন-স্মৃতিতেই উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামীর এই সুদীর্ঘ প্রবাসকালে সারদাসুন্দরীর মনে ভাবনা চিন্তার অন্ত থাকিত না কিন্তু স্বীয় উদ্বেগ ও অশান্তি লাঘবের জন্য স্বামীর সাধনায় কখনও ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী স্বীয় জননী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

"মা আমার সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনো মতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না। এইজন্য পূজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলে মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতেই যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন তিনি বাহির হইতেন না।" [১]

১ 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

সারদাসুন্দরী বহু সন্তানের জননী ছিলেন তাই সকল পুত্রকন্যার দিকে সমান দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন মাকে তিনি বেশী করিয়া পান নাই—ইহাই তাহার কারণ। শুধু তিনি নন, অধিকাংশ পুত্রকন্যাই মাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাও উল্লেখ করিয়াছেন.

> "আমার মা বহুসন্তানবতী ছিলেন এইজন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না।" [১]

ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা সংগত হইবে না যে, পুত্রকন্যা সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের অপ্রাচুর্য ছিল।

প্রথম যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন তাঁহারা মায়ের আদর বহুল পরিমাণে পাইয়াছিলেন। শোনা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি মাতার ঝোঁকটা কিছু বেশী ছিল।

কর্তাদিদিমা ও বড় জ্যেঠামশায়ের প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বিবাহ হইবে। পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য নূতন পালঙ্ক প্রস্তুত করাইবেন বলিয়া মাতা মিস্ত্রী ডাকাইলেন। এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিস্ত্রীকে সব নির্দেশ দিয়া বাড়িতেই পালঙ্ক প্রস্তুত করাইলেন।

> "বড়ো জ্যেঠামশায়ের বিয়ে হবে, কর্তাদিদিমার শখ হল একটি খাট করাবেন দ্বিজেন্দর আর বউমা শোবে। রাজকিষ্ট মিস্ত্রীকে আমরাও দেখেছি—তাকে দিয়ে কর্তাদিদিমা মতলব মাফিক সব বাতলে দিলেন —ঘরেই কাঠ কাটরা আনিয়ে পালঙ্ক প্রস্তুত হল। পালঙ্ক তো নয়, প্রকাণ্ড মঞ্চ, খাটের চার পায়ার উপর চারটে পরী ফুলদানি ধরে

১ 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

আছে, খাটের ছত্রীর উপর এক শুকপক্ষী ডানা মেলে। রূপকথা থেকে বর্ণনা নিয়ে করিয়েছিলেন বোধ হয়।······কত কল্পনা, নতুন বউটি নিয়ে ছেলে ঐ খাটে ঘুমোবে, উপরে থাকবে শুকপক্ষী।" [১]

জননীর স্নেহাচ্ছাদন যে-শুকপক্ষীর পক্ষপুটে রূপ পাইয়াছিল সে শুকপক্ষীটিও আজ অন্তর্হিত হইয়াছে।

সারদাসুন্দরী ছোট ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের খুব স্নেহ করিতেন। উৎসব উপলক্ষে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় সত্ত্বেও তিনি নিজে কাছে বসাইয়া ছেলেদের যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। "কর্তাদিদিমা কাছে বসে বলতেন, বউমা, ছেলেদের আরও খানকয়েক লুচি গরম গরম এনে দাও আরো মিষ্টি দাও—এই রকম সব ব'লে ব'লে খাওয়াতেন, বড়োদের মতো আদর যত্ন ক'রে।"

শিল্পী নাতির মনে দিদিমার বৃদ্ধ বয়সের যে ছবি মুদ্রিত আছে মুখের কথায় তাহার একটু আভাস দিয়াছেন:

"আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তাদিদিমার সে ছবি, ভিতর দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারি সবুজ রঙের, পংখের কাজ করা মেঝে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, এক পাশে একটি পিদিম জ্বলছে—বালুচরী শাড়ি প'রে, সাদাচুলে লাল সিঁদুর টক টক করছে—কর্তাদিদিমা বসে আছেন তক্তপোশে।" [২]

সাদা চুলে টকটকে লাল সিঁদুর লইয়াই তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় লন।

সারদাসুন্দরীর মৃত্যু সম্বন্ধে [illegible] অবনা

১ "ঘরোয়া"
২ "ঘরোয়া"
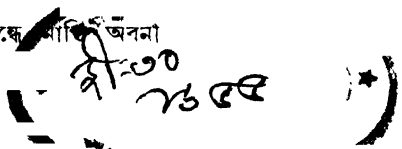
দিদিমা আঙুল মটকে মারা যান।" এক নাতনী একদিন দিদিমার আঙুল টিপিয়া দিতেছিলেন, টিপিতে টিপিতে হঠাৎ একটা আঙুল মটকাইয়া যায়। তাহার ফলে আঙুলে আঙুলহাড়া হইয়া পাকিয়া উঠে এবং জ্বর হয়। এই অসুখ আর সারে নাই।

সারদাসুন্দরীর অসুখের সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে ছিলেন। শরীরের অবস্থা যখন খুব খারাপ হইয়া উঠিল তখন সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িল। সবাই ভাবিল, মহর্ষির সহিত আর বঝি দেখা হইবে না। কিন্তু সে সংকট-কালেও এই সাধ্বী নিশ্চিত নির্ভরের সঙ্গে বলিতেন :

"তোরা ভাবিস নে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো না নিয়ে মরব না, তোরা নিশ্চিন্ত থাক।"

বিধাতা পতিব্রতার এই অবিচলিত বিশ্বাসের অমর্যাদা করেন নাই। এক সন্ধ্যায় মহর্ষি আসিয়া পৌঁছিলেন। সে রাত্রি আর প্রভাত হইল না—ব্রাহ্মমুহূর্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর পূর্বে স্বামীকে শুধু একটিমাত্র কথা তিনি বলিতে পাইয়াছিলেন : "আমি তবে চললেম।"[১]

নিতান্ত শৈশবে যাঁহার হাত ধরিয়া গৃহলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহার কাছে বিদায় না লইয়া যেন গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না।

মাতার মৃত্যুর সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। মৃত্যুকে ইহার পূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। আর মৃত্যু জিনিসটা যে কি তাহাও তাঁহার উপলব্ধির বহির্ভূত ছিল।

মাতার মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথ মায়ের কাছে ছিলেন না, তিনি অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। একজন পুরাতন দাসী তাঁহার ঘরে ছুটিয়া আসিয়া

১ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

২ সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি,' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮

"ওরে তোদের কী হল রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কবির বউ-ঠাকুরানী সেই দাসীকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন; অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া তিনি যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন। কি যে হইয়াছে ঠিক যেন বুঝিতেই পারিলেন না। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন:

"স্তিমিত প্রদীপে অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না।"

কবিজননীর মৃতদেহ প্রত্যূষেই পুষ্প চন্দনে ভূষিত করিয়া প্রাঙ্গণে বাহির করা হয়। শয্যাটি পযন্ত পুষ্প চন্দনে অভ্রে সুসজ্জিত করা হয়। মহর্ষি স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম'।"[১]

মৃত্যুর মধ্যে যে ভয়ংকরতা আছে মাতার মৃত্যুকালে তাহা কবির মনেই হয় নাই। তিনি প্রভাতে উঠিয়া প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান মাতার সুসজ্জিত দেহ দেখিয়া এই মনে করিয়াছিলেন যে মৃত্যু ও সুখসুপ্তির মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নাই। কবি লিখিয়াছেন

"সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।"

যখন মাতার দেহ সদর দরজার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল এবং পুত্রগণ মৃতদেহের পিছনে পিছনে শ্মশানে চলিলেন "তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতেও এই একটা

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', প্রবাসী মাঘ ১৩১৮

হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।"

মাতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ একবার তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। কোনও একটি তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে সেই স্বপ্নকথার উল্লেখ আছে। স্বপ্নের সহিত সত্যের হয়তো কিছু যোগও থাকিতে পারে। এই মনে করিয়া সেই স্বপ্নদর্শনের ইতিহাসটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :

> "আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, তুমি এসেছ?" [১]

মাতৃবিয়োগের দুঃখ প্রথমটা যতই প্রবল হউক তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। বালকের মাতৃবিয়োগবেদনা ভুলাইবার জন্য যিনি প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই বউঠাকুরানীর নাম এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন :

> "বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের

১ "শান্তিনিকেতন"

ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিতেন।"

শিশুকালে প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে বলিয়া কোনও আঘাতেই হৃদয়ে গভীর দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না। এই জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের "জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল।"

মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি যেন জগতে অমৃতত্ব লাভ করিলেন। শিশুকালের হারান মাকে যৌবনের রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শুভ্র সুষমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেন। বসন্তকালে কোমল চিক্কণ আধফোটা বেলফুলের কুঁড়ি নিজের ললাটের উপর বুলাইয়া মায়ের শুভ্র আঙুলগুলির কথা কবির মনে পড়িত। এই প্রসঙ্গে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"ইহার পর বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম—তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত. আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই, আর মনে রাখি।"

চাকরদের মহল

রবীন্দ্রনাথ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন বটে কিন্তু শৈশবে ভোগ-বিলাসের মুখ দেখেন নাই। ধনীর বাড়িতে ছেলেদের ভাগ্যে যে আদর যত্ন আমোদ-আহ্লাদ জোটে তিনি বাল্যকালে সে সবের কিছুই পান নাই।

এ যুগে নিতান্ত মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলেরাও যে পরিমাণ পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে বালক রবীন্দ্রনাথের পোশাকের তুলনায় তাহাকে রাজবেশ বলা যাইতে পারে। তাঁহার অদৃষ্টে বরাদ্দ ছিল দুটি মাত্র সাদা রঙের জামা। শীতের দিনে দুটি, কিন্তু গরমের দিনে একটিই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত।

জামাকাপড় অল্প বলিয়া তিনি কখনও পিতামাতার কাছে বায়না ধরেন নাই। কারণ ইহার চেয়ে বেশী পোশাক যে কোনও বালকের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে তাহা তাঁহার মনেও হইত না।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির জামা সেলাই করিত যে দরজা তাহার নাম ছিল নেয়ামত খলিফা। এই নেয়ামত খলিফা মাঝে মাঝে বালকের জামায় পকেট লাগান দরকার মনে করিত না। একে তো জামার সংখ্যা এই, তাহাতে যদি আবার পকেটের অভাব হয়, তাহা হইলে ছোট ছেলের পক্ষে সে কি কম দুঃখের কথা? পাথরের গুলি, রঙিন পেনসিল, বাঁটভাঙা ছুরি প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তিগুলি জামার পকেট ভিন্ন কোথায় রাখা যায়? তাই নেয়ামত খলিফা যখন পকেটহীন জামা সেলাই করিয়া আনিত তখন তিনি বড় দুঃখ পাইতেন।[১]

১ নেয়ামতের নামটি কবি শেষ পর্যন্ত ভুলেন নাই। "জীবনস্মৃতি"তে এ নাম আছে।

দশ বৎসর বয়সের পূর্বে তাঁহার পায়ে কখনও মোজা উঠে নাই। জুতারই ব্যবহার ছিল না, তা আবার মোজা। একজোড়া চটিজুতা ছিল তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারকারীর নিজের কথাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভাল :

"আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম - তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতা চালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।"

ধনীর গৃহে জন্মলাভের দুঃখও আছে সুখও আছে। কিন্তু আমাদের কবি ছেলেবেলায় সুখের চেয়ে দুঃখই পাইয়াছেন বেশী।

শৈশবে তাঁহার দিন কাটিয়াছে চাকরদের মহলে। ধনীর বাড়িতে শিশুরক্ষার ভার থাকে সাধারণত ভৃত্যদের উপরে। রবীন্দ্রনাথের ভার ছিল যে সব ভৃত্যের উপরে তাহারা সকলে সাধুপুরুষ ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে বালকদের উপরে মারধরও করিত। বাল্যকালের সেই স্মৃতি কিছুমাত্র মনোরম নয়। পরবর্তী জীবনে সে দিনের কথা মনে করিয়া কবি সকরুণ কৌতুকের সহিত বলিয়াছেন :

"ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাস রাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ

তাহা ছাড়া "খাপছাড়া"র একটি কবিতাতেও কবি নেয়ামতকে স্মরণ করিয়াছেন :

নীলু বাবু বলে, 'শোনো
নেয়ামৎ দর্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'

কিছুই দেখিতে পাই না। এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারংবার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল তাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই--বড়ো যে সে মারে; ছোটো যে সে মার খায়।"[১]

এই ভৃত্যরাজের মধ্যে একজনের নাম ছিল ব্রজেশ্বর। সেই ছিল চাকরদের কর্তা। ছেলেদের খাওয়ানর ভার ছিল এই ব্রজেশ্বরের উপরেই। এই লোকটি খাবার পরিবেশনের সময় এমনি কৃপণতা করিত যে পেট না ভরিলেও বেশী বার খাবার চাওয়া চলিত না। দুখানি লুচি দিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিত,—আর লুচি চাই কি?

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ভালোমানুষ। এই ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত জীবনে তাঁহাকে অনেকবারই করিতে হইয়াছে।[২] ছেলেবেলা হইতেই তাহার আরম্ভ। সে বয়সেও তিনি ব্রজেশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে চক্ষুলজ্জার খাতিরে "চাই" বলিতে পারিতেন না। লুচিগুলির উপর ব্রজেশ্বরের লোভ আছে ইহা বুঝিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, "চাই নে। তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করিত না।"

ব্রজেশ্বর আফিম খাইত। আফিমখোর লোকে আবার দুধটা একটু বেশী রকম ভালবাসে। কাজেই বালকের ভাগ্যে দুধের ভাগও সবদাই কম পড়িত। তাহা ছাড়া দুধটা তিনি নিজেও ভাল বাসিতেন না, ব্রজেশ্বর অবশ্য ইহাতে দুঃখবোধ করিত না।

[১] "জীবনস্মৃতি"

[২] বিলাতে অবস্থানকালে বেহাগ রাগিণীতে গেয় শোকগাথা সম্পর্কে যে প্রহসন সংঘটিত হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতির পাঠক সে কথা অবশ্যই স্মরণ করিবেন।

ঠাকুরবাড়িতে আর একটি চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। এই শ্যামেরই গণ্ডির কথা আগে বলিয়াছি। বাহির বাড়ির দোতলায় তোশাখানার দক্ষিণ-পূব কোণের ঘরে ইহারই আঁকা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কবির বাল্যকালের বহু দিন কাটিয়াছে।

শ্যাম লোকটা মোটের উপর নিতান্ত মন্দ ছিল না। ছেলেদের সে ভালই বাসিত। এই শ্যামকে কবি চাকরদের 'ছোটো কর্তা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বড় কর্তা ব্রজেশ্বরের কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শ্যামের "রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে ছিল তার দরদ।" [১] রঘু ডাকাত বিশু ডাকাতের গল্পে সে বালকদের আসর সরগরম করিয়া রাখিত।

ছেলেরা চিরকালই গল্প ভালবাসে। এ যুগের ছেলেরা গল্প শুনিতে পায় কম—বই পড়িয়া সে ক্ষতির কিছুটা পূরণ হয়। ছেলেদের মন অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত। অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীই এখনকার শিশুসাহিত্যের প্রায় পনের আনা অংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পশ্চিমের সহিত, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের সহিত আমাদের মিলনের ফলে অ্যাডভেঞ্চারের নানাবিধ বাস্তব ঘটনা এবং অবাস্তব কল্পনা আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইতেছে।

সে যুগে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর প্রধান উপকরণ ছিল ডাকাতি।

"ডাকাতি এখনো কম হয় না, খুনও হয় জখমও হয় লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হল খবর, এতে গল্পের

১ "ছেলেবেলা"

মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে।" [১]

যে ডাকাত সে খুন জখম করিয়া পরের অর্থ কাড়িয়া লয়। ইহা একটা বড় আদর্শের কথা নয়। কিন্তু সে যুগের ডাকাতিতে ইহারও অতিরিক্ত কিছু থাকিত। "প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাপি ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন।" [২]

শ্যাম যে রঘুডাকাত বিশুডাকাতের গল্প বলিত তাহাদের শৌর্য ও সাহসের কাহিনীর মধ্যে এমন সমস্ত উপাদান ছিল যাহা শিশুচিত্তকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। ডাকাতির দীনতা তাহাদের সমুদায় পৌরুষের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

> "শোনা যেত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা, তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত। ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা।" [৩]

অভিজাত ডাকাত সম্প্রদায়ের ছিল এই রকম ব্যবহার।

সেকালে বড়লোকদের বাড়িতে পাইক লাঠিয়ালরা ডাকাতের খেলা দেখাইত। আজকাল আমরা সার্কাসের খেলা দেখি, তাহার জন্য কত উদ্‌যোগ, কত আয়োজন। কিন্তু ডাকাতের খেলায় আড়ম্বর অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি ছিল না। একটা ঢেঁকি, একজোড়া রণ পা, বড় বড দু' চারটা

১ "ছেলেবেলা"

২ "ছেলেবেলা"

৩ "ছেলেবেলা"

লাঠি—এই হইল খেলার সরঞ্জাম। ঠাকুরবাড়িতে মাঝে মাঝে লেঠেলদের দল আসিয়া ডাকাতির খেলা দেখাইয়া যাইত।

শ্যামের মুখে শোনা ডাকাতির গল্প আর এই রকম ডাকাতির খেলা বালক কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি ছেলেবেলায় যাহা দেখিতেন এবং শুনিতেন তাহার সঙ্গে নিজের কল্পনাও অনেকখানি মিশাইয়া তাহাকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইতেন।

খাজাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে কবির ঠাকুরমাদের আমলের একটা পুরাতন পালকি পড়িয়া ছিল। বহুকাল সেটা ব্যবহার করা হয় নাই। বালক কবি ঐ পালকির মধ্যে বসিয়া কল্পনার পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া দিতেন। পালকির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি মনে মনে কত ছবিই রচনা করিতেন তাহার সংখ্যা নাই। ছেলেবেলার এই সব ছবি পরিণত বয়সের লেখায় অনেক স্থলে রূপ ধরিয়াছে।

ডাকাতের গল্প শুনিয়া এবং তাহাদের খেলা দেখিয়া হয়তো তাঁহার মনে হইত, একদিন সত্যকার ডাকাতের দেখা পাইলে ভারী মজা হয়। তিনি কল্পনায় একটি চিত্র রচনা করিলেন

মাকে লইয়া দূরদেশে যাইতেছেন। মা চলিয়াছেন পালকিতে আর বীরবালক চলিয়াছেন পাশে পাশে ঘোড়া হাঁকাইয়া। টগবগ টগবগ করিয়া ঘোড়া ছুটিয়াছে। চলিতে চলিতে একটা প্রকাণ্ড দিঘির কাছে উপস্থিত হইলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে তখনও অনেক দেরি অথচ পথের মধ্যেই সূর্য পাটে নামিলেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। অন্ধকারে পথঘাট ভাল করিয়া চেনা যাইতেছে না। মা পালকির দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ দিঘির ধার হইতে কিসের আলো তাঁহার চোখে পড়িল। এই নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে ও কিসের আলো? মায়ের

মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। তাহা দেখিয়া বীরপুত্র তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি থাকিতে মায়ের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে কে?

"এমন সময় হারে রে রে রে রে,—
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটা বনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরো থরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
আমি আছি ভয় কেন মা কর?
হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল!
আমি বলি, দাঁড়া খবরদার.
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল,—হারে রে রে রে রে।"[১]

মা নিষেধ করিলেন, কিন্তু বীরবালক সে নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দস্যুদলের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সে কি ভীষণ যুদ্ধ! ঢাল তলোয়ারের ঝন ঝন শব্দ, মানুষের আর্তনাদ, কত ডাকাতের ছিন্ন মস্তক ধুলায় গড়াইতে লাগিল, কত লোক পলাইয়া

১ বীরপুরুষ, "শিশু"

প্রাণ বাঁচাইল। এহেন যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে মায়ের মনে অশুভ আশঙ্কা জাগিতে পারে। মা মনে করিতে পারেন খোকা বুঝি মারাই পড়িল। কিন্তু খোকা যখন বীরপুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতে যায় তখন বিজয়ী না হইয়া ফিরে না।

ডাকাতির গল্প শুনিয়া বালকের মনে বীরত্বের যে অপূর্ব আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রূপকথার মত অবাস্তব কিন্তু রূপকথার মতই সহজ ও সরল। শিশুর মন যে রূপকথারই রাজত্ব। সে রাজ্যে সবই সম্ভব, সবই সত্য। সে রাজ্যে বালক বীর একলা ঘোড়া ছুটাইয়া যায়, একলা তলোয়ার চালাইয়া হাজার হাজার ডাকাতকে ভূলুণ্ঠিত করে, আবার লড়াই থামিয়া গেলে বীরদর্পে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের পালকির কাছে দাঁড়ায়, মা অমনি পালকি হইতে বাহিরে আসিয়া চুমো খাইয়া কোলে তুলিয়া লন; এবং সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন :

"...ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।"

কিন্তু হায় ঠাকুরমার আমলের পালকির মধ্যে যে পক্ষিরাজ উড়ে বাহিরে পা দিলেই সে ডানা গুটাইয়া বসে।

যে কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল ইহা বাল্যকালের নহে, কবি পরিণত বয়সেই উহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গল্পের পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত যে সেই বহুকালের পরিত্যক্ত পুরাতন পালকির মধ্যেই হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাহিরের ডাক

কবির শৈশবে স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না। শাসন ও বন্ধনের মধ্যেই তাঁহার প্রথম জীবন কাটিয়াছে। বাড়ির বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। বাড়ির মধ্যেও যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান নিষিদ্ধ ছিল।

তাঁহার এই বন্দী জীবনে কয়েকটি খুব ভাল সঙ্গী জুটিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে একটির নাম আগেই বলিয়াছি—সেই ঘাটবাঁধান পুকুরটি। আর একটি হইল ঘাটের পূর্বধারের সেই প্রকাণ্ড চীনাবটের গাছটা।[১] বেশী বয়সেও ইহাদের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন এই গাছটাকে স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন:

“লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা হোথায় রবির ছটা
পুকুরধারে বট।
দশদিকেতে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আঁকা বাঁকা
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা
শিরে আকাশ পট।”[২]

১ এই বটগাছটির অন্তর্ধানের ইতিহাস অবনীন্দ্রনাথের “ঘরোয়া”য় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের যখন তরুণ বয়স তখন ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই অভিনয় চলিত। বাল্মীকি-প্রতিভার স্টেজ তৈয়ারি করিতে গিয়া বনের দৃশ্যের জন্য এই বটগাছের ডাল প্রায়ই কাটা হইত। এমনি করিয়া গাছটা যখন অনেকটা কাটা হইয়া গিয়াছিল তখন একদিন ঝড়ে বাকীটুকু পড়িয়া যায়।

২ পুরোনো-বট, “শিশু”

একদিন অচেতন বটগাছের সঙ্গে সচেতন মানবশিশুর মিতালি হইয়াছিল। মানবশিশু শৈশব অতিক্রম করিয়াও তাহাকে ভুলে নাই। কিন্তু অচেতন বন্ধুটিও কি সেই পুরাতন দিনের কথা মনে করিয়া রাখে?

"নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট?
কতই পাখি তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে
ছোটো ছেলেরে তাদেরি মতো
ভুলে কি যেতে আছে?" [১]

কঠিন গৃহপ্রাচীর দেহকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও দোতলার কোণের ঘরের জানালার ফ্রেমে বাঁধানো প্রকৃতির যে চলচ্চিত্রটুকু তাহার চোখে পড়িত মনকে তাহা আকর্ষণ করিয়া সবলে মুক্ত করিয়া দিত।

"স্বাধীন বিহঙ্গসম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।"

পিঞ্জরের লৌহশলাকায় সেই উন্মাগ বিহঙ্গকে বদ্ধ রাখে এমন ক্ষমতা কাহার আছে?

বটগাছের শাখায় শাখায় পাখীরা ভিড় করিয়া বসিত। পিঞ্জরের এই পাখীর হৃদয়টিও তাহারই মধ্যে ক্ষুদ্র নীড় রচনা করিয়াছিল। তাহার অপরিণত অপূর্ণ সাধগুলি ভালবাসার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল।

[১] পুরোনো-বট, "শিশু"

বন্দী বালক ঘরের মধ্যে বসিয়া সারাটি দুপুর জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কাটাইয়া দিতেন। সেদিন তাঁহার

"......খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড় জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।"

দূর হইতে ঐ পুকুরটাকে দেখিয়া মনে হইত তাহারও বন্দী দশা।

"সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়।"[১]

সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ এই সংকীর্ণ সীমাটুকুর মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, তাহার সেই ফেনিল উচ্ছ্বাস এই চতুষ্কোণ মৃদ্‌বলয়ের বেষ্টনে রুদ্ধশ্বাস, তাহার উন্মত্ত উদ্দাম গর্জন ইহারই স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দে গুমরাইয়া মরিতেছে।

ঐ পুকুরটার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কত সৃষ্টিছাড়া কল্পনার উদয় হইত। উহার অদৃশ্য অন্ধকার তলায় বালককবি বিচিত্র মায়াপুরী রচনা করিয়া চলিতেন।

"উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মানিক দর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী

১ জল, "আকাশপ্রদীপ"

ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশু পাখি
তারা আছে অন্য লোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।"[১]

যেমন এই পুকুর তেমনি চাঁপাবটটিও তাঁহার কল্পলোকের সঙ্গী ছিল।

এই বটগাছের তলাটা ছিল ছায়ায় ঢাকা। গাছের ঝুরি গুঁড়িটার চারিদিক ঘেরিয়া সন্ন্যাসীর জটার মত ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ঘন পাতার গহন ঘটায় বৃক্ষতল একেই তো অন্ধকার, এই ঝুরিগুলা সেই অন্ধকারকে আরও নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছিল। দোতলার সেই কোণের ঘরটিতে বসিয়া তিনি কতদিন এই গাছটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সারা দ্বিপ্রহর কাটাইয়া দিয়াছেন। এই বটগাছের মধ্যে যেন কি রহস্য লুকান ছিল।

"পূর্বতীরে বৃদ্ধবট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে।
একদিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোক ছায়ার আলাপন,

১ জল, "আকাশপ্রদীপ"

অন্যদিকে দূর নিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন:

"আমি কী আত্মার মধ্যে কী বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম-বিস্ময়াবহ।"[২]

নিতান্ত শিশুকাল হইতেই এই বিস্ময়ের অনুভূতি তাঁহার মনকে নাড়া দিয়াছিল। পৃথিবীর মাটিতে যে বৃদ্ধবট বদ্ধ রহিয়াছে তাহার সহিত অদৃশ্য নাগলোক এবং অনন্ত আকাশের আলাপন কল্পনা করিতে তাঁহার বাধে নাই।

বয়স একটু বাড়িলে চাকরদের শাসন একটু শিথিল হইল। অন্তঃপুরে চলাচলের বাধাও কিছু কিছু কমিয়া আসিল। তখন তিনি মাঝে মাঝে দুপুর বেলা বাড়ির ছাদে আসিয়া পৌঁছিতেন। ছেলেবেলায় কবি লিখিয়াছেন, "আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ।" ছাদের পাঁচিল খুব উঁচু। কিন্তু পাঁচিলের মাঝে মাঝে ফাঁক ছিল। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া তিনি বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহার চোখে পড়িত ভিতরের বাগান আর সেই বাগানের ধারে সারি সারি নারিকেলের গাছ। কখনও কখনও সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কবি ছাদে আসিয়া সূর্যোদয় দেখিতেন। সেই শৈশবের কথা মনে করিয়া কৈশোরের শেষপ্রান্তে আসিয়া কবি লিখিয়াছেন:

১ জল, "আকাশপ্রদীপ"
২ "বঙ্গভাষার লেখক"

"চাহিয়া ধরণীপানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর একদিন।
সে তখন ছেলেবেলা রজনী প্রভাত হলে
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি উঠিয়া যেতেম চলে।
সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।

... ...

মাঝেতে বাঁধানো বেদী জুঁইগাছ চারিধারে
সূর্যোদয় দেখা দিত প্রাচারের পরপারে।"[1]

প্রভাতসূর্যের প্রথম আলোকধারায় তিনি অবগাহন করিয়া ধন্য হইতেন।

"নবীন রবির আলো
সে যে কী লাগিত ভালো,
সর্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে
প্রভাতফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।"[2]

এই ভাবে ফুল পাখি গাছ পাতার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সহিতও তাঁহার প্রত্যক্ষতর পরিচয় আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহাতেও মন তৃপ্তি পায় না। তাহাকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতেন, তখন ছাদটাই ছিল বালকের আনন্দের বিহারভূমি। নীচের তলার বদ্ধ মন যেন ছাদে

১ পুনর্মিলন, "প্রভাতসংগীত"
২ পুনর্মিলন, "প্রভাতসংগীত"

উঠিয়া মুক্তি পায়। ছাদের উপর হইতে যেদিকে তাকান যায় উঁচু নীচু ছাদ পার হইয়া দৃষ্টি যতদূর যায় কোথাও কোনও বাধা পায় না, মনও না।

দুপুরবেলায় চাকরদের দৃষ্টি এড়াইয়া অনেক সময় বালক রবীন্দ্রনাথ ছাদে উঠিয়া একলা বসিয়া থাকিতেন। এই দুপুরবেলাটা বালকের মনে কেমন একটা উদাস ভাব আনিয়া তুলিত। তিনি বলিয়াছেন :

> "বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়।"

নীরব মধ্যাহ্নে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন। দেখিতেন আকাশে চিল উড়িয়া যাইত, চিলের তীক্ষ্ণ স্বর শোনা যাইত। সামনের গলি দিয়া চুড়িওয়ালা হাঁক দিয়া যাইত—চুড়ি চাই, চুড়ি চাই।

আট বৎসর বয়সের আগে তিনি কখনও কলিকাতার বাহিরে যান নাই কিন্তু তাঁহার মন ঘরের বাঁধন মানিত না, সে কল্পনার সাহায্যে জলে স্থলে পাহাড়ে পর্বতে আলোয় আঁধারে আপনার পথ আপনি করিয়া লইত।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন "কবিকাহিনী" নামে একখানি বই রচনা করেন। ইহার কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে। কবি বাল্যকালে যাহা পান নাই, অথচ যাহা পাইবার জন্য তাঁহার মনে আগ্রহের সীমা ছিল না, এবং যাহা না পাইয়াও কল্পনায় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাহার একটি সুরম্য চিত্র আছে। কবিকাহিনীর নায়ক একজন কবি। এই কবির শৈশবকাল কাটিয়াছে মুক্ত প্রকৃতির বুকে। তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা এই কাব্যে আছে। শিশুকবির নিজের জীবনে যে সাধ অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে গল্পের কবির জীবনে তাহা চরিতার্থ হইয়াছে। কবি-কাহিনীর কবি কল্পনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

> "শুন কলপনাবালা ছিল কোনো কবি
> বিজন কুটির তলে। ছেলেবেলা হতে

তোমারি অমৃত পানে আছিল মজিয়া ;

... ...

প্রফুল্ল উষার ভরা অরুণ কিরণে
বিমল সরসী যবে হ'ত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর,
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার,
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।"

প্রকৃতিকে তিনি এমনি করিয়া আত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন। গাছ-পাতা নদ-নদী সূর্য-চন্দ্র প্রভাত-সন্ধ্যা তাঁহার মনকে এমনি ভাবে নাড়া দিয়াছিল।

বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই তিনি যে মুক্তির কল্পনায় বিভোর ছিলেন সে মুক্তি একদিন সত্য সত্যই দেখা দিল। যে প্রকৃতি দূর হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিতেন তাঁহার দক্ষিণ করের স্নেহসুকোমল স্পর্শ সেদিন তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলেন শৈশবদিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জীবন-পঞ্জিকায় স্মৃতির স্বর্ণাক্ষরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল।

তখন বয়স মাত্র আট, নর্মাল স্কুলে পড়িতেছেন। হঠাৎ কলিকাতায়

ডেঙ্গুজ্বর দেখা দেওয়ায় পরিবারের কেহ কেহ পেনেটিতে গিয়া একটি বাগানবাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এই বাগানবাড়িটি ছাতুবাবুর বাগান নামে পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও অভিভাবকদের সঙ্গে সেখানে যান। এই তাঁহার প্রথম বাহিরে যাওয়া।

বাড়ির বারান্দায় বসিলে গঙ্গা দেখা যায়। গঙ্গা এবং বারান্দার মধ্যে ছিল একসারি পেয়ারা গাছ। বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া বালক গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন।

দুর্ভিক্ষের দেশ হইতে আনিয়া কাহাকেও ভোজ্যের ভাণ্ডারে বসাইয়া দেওয়া হইলে তাহার যে অবস্থা হয় বালকেরও সেইরূপ হইল। যে অমৃতের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঙালের মত ব্যাকুল হইয়া ছিল প্রকৃতি সেই অমৃতভাণ্ডের মুখাবরণ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। সে অক্ষয়-ভাণ্ড তিলমাত্র শূন্য হইবার নহে তবু লুব্ধের মত তাহার এতটুকুও নষ্ট করিতে তাঁহার মন সরিত না। প্রকৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভার দেখিয়া বালকের চিত্ত দুই বাহু বাড়াইয়া সবটুকুকে অধিকার করিতে চাহিত। "জীবনস্মৃতি"তে কবি সেদিনের কথা লিখিয়াছেন :

> "প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।"

গঙ্গার উপর জোয়ার ভাঁটা আসিতেছে যাইতেছে, কত রকমের নৌকা কত দিক হইতে, কেহ বা পাল তুলিয়া কেহ বা দাঁড় বাহিয়া, আসা যাওয়া করিতেছে। নদীবক্ষের এই চিরচঞ্চল লীলা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পেয়ারা গাছের ছায়া পশ্চিম হইতে পূবদিকে সরিয়া যায়,

পরপারে বৃক্ষশ্রেণী সূর্যাস্তের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মনও নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া সপ্তসমুদ্রে পাড়ি দেয়। "জীবনস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন :

"পাল তোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

সেদিনকার সেই "বিনা ভাড়ায় সওয়ারি মন" অনেক দিন পরে 'কাগজের নৌকা'য় পাল তুলিয়াছিল। গঙ্গার নৌকা হয়তো গঙ্গালাভ করিয়াছে কিন্তু সেই 'কাগজের নৌকা' আজও অনির্দেশের পথে ভাসিয়া চলিয়াছে

"কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু করিবে না মানা,
ধরে নাহি রাখে ফিরে নাহি ডাকে
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী তারি 'পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে।" [১]

পেনেটির বাগানবাড়ির বারান্দায় বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া নদীর ওপার অতলস্পর্শ রহস্যের বিচিত্র কল্পনায় মন মগ্ন হইয়া যায়। সেদিনকার ভাবনার স্রোত পরবর্তী কালের কত রচনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায় :

"আমি বসে বসে তাই ভাবি
নদী কোথা হতে এল নাবি।

১ কাগজের নৌকা, "শিশু"

কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।”[১]

বালকের মনে হয়:

“মধুমাঝির ঐ যে নৌকাখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে,
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে।
আমি কেবল যাই একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।”[২]

শহরের ছেলে, ইঁটকাঠের পাষাণ-বেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মন হাঁপাইয়া উঠিত, ইচ্ছা করিত বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে একবার দেখিয়া আসেন। পেনেটির বাগানবাড়িতে আসিয়া সেই পাড়াগাঁর আভাস পাওয়া গেল বটে কিন্তু দেখার সুযোগ মিলিল না। বাগানের বাহিরে যাওয়ায় অভিভাবকদের নিষেধ ছিল। বাহিরে আসিয়াও স্বাধীনতালাভ তখন পর্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। তখনকার অবস্থা “জীবনস্মৃতি”র একটিমাত্র ছত্রে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:

১ নদী, “শিশু”

২ নৌকাযাত্রা, “শিশু”

"ছিলাম খাঁচায় এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।"

কিছুদিনের মধ্যেই খাঁচার পাখীকে আবার খাঁচায় ফিরিতে হইল কিন্তু দাঁড়ে-বসা দিনগুলি আর মন হইতে মুছিল না। যৌবনের একটি কবিতায় সে দিনগুলি অমর হইয়া আছে :

"আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলেফুলে,
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা
জাহ্নবীপ্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারা বেলা,
ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে ঝুরু ঝুরু বহে যায়,
ঝরঝর মরমর পাতা ঝরে পড়ে যায়।
সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্যে কত দেশে
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর
কত ছোটো ছোটো গ্রাম
নূতন নূতন নাম
অভ্রভেদী শুভ্রসৌধ কত নব রাজপুর।"[১]

রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকটি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে অভিনয়যোগ্য যে সব গুণ থাকা উচিত ইহার সে সব আছে কি না তাহা বর্তমানে বিচার্য নয় কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিতে কয়েকটি মাত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবি যে রুদ্ধ জীবনের মর্মব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত গভীর বলিয়াই মর্মকে স্পর্শ করে। স্বহস্তনির্মিত বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মানুষের যে ব্যাকুলতা,

পুনর্মিলন, "প্রভাতসংগীত"

অমলের চরিত্রে তাহাই কবি রূপায়িত করিয়াছেন ; কিন্তু এই অমলকে তিনি পাইলেন কোথা ? সে কি একান্তভাবে তাঁহার কল্পনা হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে ? রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের দিকে তাকাইলে তাহার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলিয়াছেন :

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁকফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত।"

দইওআলা, ডাকহরকরা, ঠাকুরদা সবাই মিলিয়া যে অদৃশ্য রাজার ইঙ্গিত অমলের কাছে বহন করিয়া আনিত এই ইশারার সহিত তাহার পার্থক্য কোথায় ?

লেখাপড়া

রবীন্দ্রনাথের এক দাদা সোমেন্দ্রনাথ। ইনি কবির অপেক্ষা প্রায় এক বৎসরের বড় ছিলেন।[১] আর এক ভাগনে ছিলেন তাঁহার নাম সত্যপ্রসাদ। ইঁহার বয়সও ঐরূপই ছিল। সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর[২] পুত্র।

এই তিনটি প্রায়-সমবয়সী বালকের একত্র লেখাপড়া শুরু হয়। লেখাপড়ার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের[৩] হাতে : তিনি ছিলেন খুব কড়ারকমের শাসনকর্তা।

বালক রবীন্দ্রনাথের একটি দিনের কর্মতালিকা তুলিয়া দিতেছি। ছেলেবেলায় তাঁহাকে যে কি রকম পরিশ্রম করিতে হইত এই তালিকা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

অন্ধকার থাকিতেই বিছানা হইতে উঠিয়া লঙ্‌টি পরিয়া কিছুক্ষণ কুস্তি লড়িতেন। কুস্তি শিখাইবার জন্য একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিল—কানা পালোয়ান। দালান ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি পড়িয়া ছিল। জমিটা যে চিরকালই ফাঁকা ছিল তাহা নয়। পূর্বে এখানে গোলাবাড়ি ছিল। সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান গোলা ভরিয়া রাখা হইত। নাগরিক সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গোলাবাড়ির অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও সে গোলাবাড়ি দেখেন নাই। সেখানকার ফাঁকা মাঠে গোলাবাড়ি স্বীয় নাম ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

১ ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে জন্ম

২ সৌদামিনী দেবী—জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৯২০

৩ হেমেন্দ্রনাথ জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৮৮৪

এই ফাঁকা মাঠের ধারে যে প্রাচীর তাহারই গা ঘেঁষিয়া কুস্তির চালাঘর তৈয়ারি হইয়াছিল। কুস্তির সুবিধার জন্য মাটি এক হাত আন্দাজ খুঁড়িয়া আলগা করিয়া সরিষার তৈল এক মণ ঢালিয়া তাহা নরম করা হইয়াছিল।

বালক রবীন্দ্রনাথের কুস্তিশিক্ষা ছিল নিতান্তই ছেলেখেলা। প্যাঁচ-কষা যতটা হইত মাটি মাখা হইত তাহার তুলনায় অনেক বেশী।

কুস্তির আখড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরম্ভ হইত অস্থিবিদ্যা। মেডিকাল কলেজের একজন ছাত্র প্রতিদিন সকালে আসিয়া বালকদের এই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। দেহের কোন্ অংশে কটা হাড় আছে, কোন্ হাড়ের কি নাম, কোন্ হাড়ের কি কাজ এই সব বিষয় সহজে শিখিবার জন্য একটা আস্ত কঙ্কাল কিনিয়া আনা হইয়াছিল। কঙ্কালটাকে পড়ার সময় দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ইংরেজীর মাস্টারমহাশয় অঘোরবাবুও মেডিকাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে মধ্যে তিনিও কখনও কখনও মনুষ্যের দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

> "তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং বিষয় ছিল ইংরেজি। শিক্ষণীয় বিষয়কে সুকুমার ছাত্রদের কাছে সরস করিয়া তুলিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল অতিশয় কোমল। তিনি ভুজবলে ···শাসন করিতেন না; মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়।"

তথাপি তাঁহার শিক্ষাদান ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য মনে হইত না। কালো কালো মলাটের ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক, সে মলাট ঢলঢলে, পাতাগুলা ছিন্নপ্রায়, তাহার যেখানে সেখানে কবির নিজের হাতে

লেখা ক্যাপিটল অক্ষরে নিজের নাম—অর্থাৎ সে বইএর মধ্যে এমন রস কিছু ছিল না যাহাতে শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে। সুতরাং ইংরেজী পড়াইতে গিয়া অঘোরবাবু যে ছাত্রদের মনোহরণ করিতে কৃতকার্য হইতেন না তাঁহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। "সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরে দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সেই কারণেই তিনি কখনও কখনও "পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণ হাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব। এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।" কেমন করিয়া মানুষের কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হয়, কেমন করিয়া মানুষ কথা বলে—এই রহস্য তিনি বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা ছাড়া এই মাস্টার মহাশয় ছাত্রদের মনে কৌতূহল সঞ্চার করিবার জন্য একদিন মেডিকাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরেও লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ ছিল এবং মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল। টেবিলের উপরে শয়ান সম্পূর্ণ মৃতদেহটা দেখিয়া তাঁহার তেমন ভাবান্তর হয় নাই কিন্তু ঐ পায়ের টুকরাটা দেখিয়া তাঁহার মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা তিনি অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই। কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা শুনিয়াও ঠিক এই কারণেই

তাঁহার মনে কেমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। তিনি জানিতেন "সমস্ত মানুষটাই কথা কয়, কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায় ইহা কখনো মনেও হয় নাই।"

শরীরতত্ত্ব পর্যালোচনার নানাবিধ উপকরণসম্ভারের মধ্যে পড়ার ঘরের দেয়ালে দোদুল্যমান কঙ্কালটিই তাঁহাকে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক চঞ্চল করিয়া তুলিত। ইহার কথা তিনি কোনও দিন ভুলিতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি 'কঙ্কাল' নামে একটি গল্প লিখিয়াছেন— এই কঙ্কালই তাহার প্রধান উপাদান।

'কঙ্কাল গল্পের ভূমিকায় শিক্ষাজীবনের প্রথম দিককার কথাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইয়াছে :

> "আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেওয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যামবেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম।"[১]

সকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া অস্থিবিদ্যা শিক্ষা করা হইত। অস্থিবিদ্যা শেষ হইতে না হইতেই নীলকমল ঘোষাল আসিয়া পড়িতেন। এই নীলকমল মাস্টারমহাশয়ের নিয়মানুগত্য ছিল অসাধারণ। দেউড়িতে সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আবির্ভাব হইত।

> "নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না।"

১ কঙ্কাল, "গল্পগুচ্ছ"

নীলকমলবাবু গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন—পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সবই বাংলায় পড়ান হইত। গণিতশাস্ত্র ছাড়া আরও অনেক বিষয় সকাল বেলা পড়িতে হইত। "চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া।" জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও এই নীলকমল মাস্টারই পড়াইতেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। তিনি সকালবেলা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া পড়াইতেন। কানা পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিক্ষার পর হইতে ইস্কুল যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবটুকু সময় ইঁহারই হাতে ছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন: কুস্তিশিক্ষার "পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপর জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত।" চারুপাঠ বস্তুবিচার প্রভৃতির কথা তো আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময়ের কিয়দংশ অস্থিবিদ্যা শিক্ষার জন্যও ব্যয়িত হইয়াছিল।

বাংলা শিক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইলে তবে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহপাঠীরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। তথাপি ইংরেজীর প্রথম পাঠ যে খুব সহজ বোধ হয় নাই ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। ইংরেজীর উচ্চারণপ্রণালী আয়ত্ত করা যে বাঙালী বালকের পক্ষে অতিশয় দুরূহ তাহা অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন। বুঝা যায় নিজের বাল্যকালেই তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। রহস্যচ্ছলে এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন:

"যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি

ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না।"

এই ছাব্বিশটা অক্ষর বর্গির উপদ্রব অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে :

"ইংরেজের কামান আছে বন্দুক আছে কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কি কম!"[১]

তাহাতে সুবিধা এই হইয়াছিল যে বাংলা ভাষাটা অতি অল্পবয়সেই তাঁহারা বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং একটা ভাষা ভালো করিয়া দখল হওয়াতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অনেক সহজ হইয়াছিল। আট নয় বৎসর মাত্র বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথ সীতার বনবাস শেষ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন।

সকাল বেলাকার নিত্যপাঠ্য ও নিত্যকর্মের একটি তালিকা তো দেওয়া হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে নৈমিত্তিকেরও অভাব ছিল না। সকালবেলাকার ঐ তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় কিছু ভাগ লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন। এই সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। অস্থিবিদ্যাও তাঁহার কাছে নীরস বোধ হইত।

রবিবারের কর্মতালিকায় একটু নূতনত্ব ছিল। রবিবার সকালে রবীন্দ্রনাথ গান শিখিতেন বিষ্ণুর কাছে। ইহা ছাড়া সীতানাথ দত্ত মহাশয় কোনো কোনো রবিবার আসিয়া যন্ত্রতন্ত্র দিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। কাচের পাত্রে জল দিয়া সেই পাত্রটি আগুনে চড়ানো হইত।

১ "শব্দতত্ত্ব"

পাত্রের নিচের জল তাপ সহযোগে পাতলা হইয়া উপরে উঠিতে থাকিত এবং উপরের ভারী জল নিচে নামিতে থাকিত। জলে কাঠের গুঁড়া মিশাইয়া সীতানাথ দত্ত জলের উন্নয়ন অবনয়ন যখন স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেন তখন বালকের মনে বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। এইরূপ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানশিক্ষায় তাঁহার এত ঔৎসুক্য ছিল যে, যে রবিবার সীতানাথ দত্ত মহাশয় কোনো কারণে আসিতে পারিতেন না সে-রবিবার বালকের কাছে রবিবার বলিয়া মনে হইত না।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :

"বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় দশ বছর; মাঝে মাঝে হঠাৎ রবিবারে আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়।..বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নিচে নামতে থাকে; জল ফুটতে থাকার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে এরকম নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারই বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে।"[১]

সকালের পালা শেষ হইলে ইস্কুল। ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াও নিষ্কৃতি নাই।

সাড়ে চারিটার সময় ঘোড়ার গাড়ি যখন বাড়ির দেউড়িতে আসিয়া থামে জিমনাস্টিকের মাস্টার মহাশয় তাহার আগেই আসিয়া হাজির

১ "বিশ্বপরিচয়"

থাকেন। একটু জলযোগ শেষ করিয়াই তাঁহার সহিত যোগ দিতে হয়। ঘণ্টাখানিক ধরিয়া ব্যায়াম শিক্ষা হয়। অন্যান্য ব্যয়ামের মধ্যে প্যারালাল বারের ব্যবস্থা ছিল।

ব্যায়াম শেষ হইতে না হইতেই আসেন ছবির শিক্ষক। তাঁহার কাছে কিছুক্ষণ ধরিয়া চিত্রাঙ্কন বিদ্যার অনুশীলন চলে। দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই ছবির কাজ শেষ হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে পড়িবার ঘরে তেলের বাতি জ্বালা হয় এবং ইংরেজীর শিক্ষক অঘোরবাবু যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। নীলকমলবাবুর মতো অঘোর বাবুরও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে কখনও শৈথিল্য দেখা যায় নাই। জল হউক, ঝড় হউক. রাস্তায় এক হাঁটু জল জমুক, পৃথিবীতে যত বড়ই দৈবদুর্যোগ ঘটুক না কেন অঘোরবাবু কখনও কামাই করিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাশিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়া ইংরেজীশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অঘোরবাবু যখন পড়াইতে আরম্ভ করেন তখন কবির বয়স আট নয় বৎসর হওয়া সম্ভব। প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক অফ রীডিং ও সেকেণ্ড বুক অফ রীডিং দিয়া রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষার সুচনা হয়। তাহার পরই ধরানো হয় মকলক্‌স্ কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানি বই।

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, “আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন।” এবং সেইজন্য “সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনার জাঁতাকল চলছেই”—এ উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাল্যকালের একটি প্রাত্যহিক কার্যতালিকা রচনা করিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে তাঁহার প্রথম পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সহজ হইবে।

বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা

বয়স ছয়-সাত হইতে সাত-আট বৎসর

সোমবার হইতে শনিবার

সকাল ৫ হইতে ৬	সকাল ৬ হইতে ৯	সন্ধ্যা ৬ হইতে ৯
কুস্তি কানা পালোয়ান[১]	বোধোদয়,[২] চারুপাঠ, বস্তুবিচার, পাটিগণিত, সীতার বনবাস নীলকমল ঘোষাল	রামায়ণ এবং মহাভারত-পাঠ শ্রবণ পাঠক ব্রজেশ্বর পাঁচালি গান শ্রবণ গায়ক কিশোরী চাটুজ্যে [৩]

বেলা ১০-৩০ হইতে ৪। ইস্কুল

[১] ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[২] "যেদিন বোধোদয় পড়ার উপলক্ষ্যে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি···।" "জীবন-স্মৃতি"

[৩] সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত শোনাইত।" "জীবন-স্মৃতি"

"এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ ·· কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল" "জীবন-স্মৃতি"

বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা

বয়স সাত-আট হইতে নয়-দশ বৎসর

সোমবার হইতে শনিবার। সকাল

৫ হইতে ৬	৬ হইতে ৭	হইতে	৯ হইতে ৯-৩০
কুস্তি	অস্থিবিদ্যা	ভূগোল, ইতিহাস, বস্তুবিচার, মেঘনাদবধ কাব্য, চারুপাঠ, প্রাণি-বৃত্তান্ত, পাটিগণিত, রেখাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি	মুগ্ধবোধ
কানা পালোযান[১]	মেডিকাল কলেজের অথবা ক্যামবেল মেডিকাল স্কুলের জনৈক ছাত্র[২]	নীলকমল ঘোষাল[৩]	হেরম্ব তত্ত্বরত্ন[৪]

১ "ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লঙ্‌টি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত।" "জীবনস্মৃতি"

"অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত।"

"ছেলেবেলা"

২ অনুমান করা গেল কুস্তিশিক্ষায় এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইত। সেইজন্য অস্থিবিদ্যা শিক্ষার সময় ৬টা হইতে ৭টা ধরা হইয়াছে। জীবনস্মৃতিতে অবশ্য বলা হইয়াছে "সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার (নীলকমল ঘোষালের) উপর ছিল" কিন্তু আবার ছেলেবেলায় দেখিতেছি, "দেউড়িতে বাজল সাত। নীলকমল মাস্টারের ঘড়িধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না।" ইহা হইতে বোঝা যায় নীলকমল মাস্টার আগে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এবং তিনি যখন প্রথম শিক্ষকতার ভার লন তখন ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্তই পড়াইতেন। তাহার পর যখন অস্থিবিদ্যার মাস্টার মহাশয় উপস্থিত হইলেন, তখন হইতে নীলকমল বাবুর কার্যকাল একঘণ্টা কমিয়া গেল। তিনি সাতটা হইতে পড়াইতে লাগিলেন। অস্থিবিদ্যার মাস্টার মহাশয় যে পরে কাজ আরম্ভ করেন তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে অনুমান করা যায়।

"ইহা ছাড়া ক্যামবেল মেডিকাল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম।"

অস্থিবিদ্যা শিক্ষার সূচনা যখন হইল তখন হইতে কুস্তির পরই অস্থিবিদ্যা শেখা হইত। ছেলেবেলায় আছে :

"কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিকাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে।"

"জীবনস্মৃতি" হইতে পাওয়া যায়—ক্যামবেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্র। "ছেলেবেলায়" আছে – মেডিকাল কলেজের ছাত্র।

৩ "জীবনস্মৃতি"র 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪ "মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করতে।" "ছেলেবেলা"

বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা

বয়স সাত-আট হইতে নয়-দশ বৎসর

সোমবার হইতে শনিবার

বেলা ১০-৩০ হইতে ৪

ইস্কুল

বিকাল ৪-৩০ হইতে ৫-১৫	৫-১৫ হইতে ৬	সন্ধ্যা ৬ হইতে ৯
ব্যায়াম অনুশীলন প্যারালাল বার প্রভৃতি[১] জিমনাস্টিকের মাস্টার	চিত্রাঙ্কন[২] ড্রয়িং মাস্টার	ইংরেজী ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, পরে মকলক্স্ কোর্স অফ রীডিং ইত্যাদি অঘোরবাবু

বয়স ছয়-সাত হইতে নয়-দশ বৎসর

রবিবার সকাল

৬ হইতে ৭	৭ হইতে ৯
গান বিষ্ণু চক্রবর্তী[৩]	যন্ত্রপাতিযোগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা সীতানাথ দত্ত[৪]

১, ২ "সাড়ে চারটার পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিমনাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি আঁকার মাস্টার।" "ছেলেবেলা"

৩, ৪ ৭২ ও ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ যুগে ছোট ছেলেদের জন্য যে সব বই তৈরি হয় তার ছাপা কি সুন্দর! ভিতরে বাহিরে রং বেরঙের কত ছবি, কত গল্প ছড়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখন এ সবের কিছুই ছিল না। পড়ার বইটা পড়িতেও ভাল লাগা চাই দেখিতেও ভাল লাগা চাই। তাহা না হইলে ছোটছেলের মন বসিবে কেন? ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক পড়া শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজী বই ধরেন তাহার কথা তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

একে ইংরেজী বই—কঠিন এবং অপরিচিত। তাহার উপর চেহারাও সুন্দর নয়। যদি মলাটটাও দেখিতে একটু রং-চঙা হইত তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাইত—কিন্তু তাহাও ছিল না। উহার মলাটটা ছিল যেমন কালো তেমনি মোটা। সে বই খুলিতে ইচ্ছা হইত না আর খুলিলেও বিশেষ লাভ হইত না। কারণ, পড়া শুরু করিতে না করিতেই পড়ুয়াদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িত। কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের[১] নজরে পড়িলে তিনি নিদ্রাতুর বালকদের ছুটি দিয়া দিতেন। কিন্তু মজা এই যে বইএর পাতা বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পাতা খুলিয়া যাইত।

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ—জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯২৬

ইস্কুলের পড়া

বাড়ির পড়া তো পুরা দমেই চলিয়াছিল। এদিকে ইস্কুলের পড়াও ছিল। নিতান্ত শিশুবয়সেই তিনি ইস্কুলে ঢুকেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের আর দুইজন সহপাঠী ছিলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ। সহপাঠী হইলেও ইঁহারা বয়সে কবির অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন সুতরাং তাঁহারাই প্রথমে ইস্কুলে ঢুকিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর ছয়েক হইবে। বাড়ির বাহিরে যাইবার সুযোগ তখনও তাঁহার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটে নাই। তাহার উপর সঙ্গীরা ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া প্রত্যহ দশটার সময় তাঁহাকে একলা ফেলিয়া যাইতেছেন। ইস্কুল যাইবার পক্ষে এতগুলি প্রলোভন। কিন্তু অন্তরায় হইল বয়স। অভি-ভাবকেরা তাঁহাকে ইস্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য করিলেন না।

ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ বাল্যকালে বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুলের সহিত বাক্যা-লাপে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতেন বলিয়া নামের মর্যাদা সর্বদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। "তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না বাল্যকালে কৌতুকচ্ছলে তিনি সকলপ্রকার অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।"

জাদুকর বন্ধুর নিকটে মাতুলের বালকবেশকে ছদ্মবেশ বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া তিনি যে 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়।[১]

জীবনস্মৃতিতে 'হিমালয় যাত্রা' প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, "সত্য

১ "জীবনস্মৃতি"র 'বাংলাশিক্ষার অবসান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

বলিয়াছিল বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়িতে চড়া ভয়ংকর সংকট—পা ফসকাইয়া গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ি যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাক্কা দেয় যে মানুস কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না।··· তাঁহার কাছে ভ্রমণবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর কোনো ভদ্রঘরের শিশু তাহা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিত না।"

এহেন সত্যপ্রসাদ "যখন ইস্কুলপথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না।" তিনিও ইস্কুলে যাইবার জন্য বায়না ধরিলেন, তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বালকের সর্বশেষ সম্বল—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। বালকের পক্ষে অভিপ্রায়প্রকাশের চিরন্তন উপায় ক্রন্দন এবং অন্যপক্ষে তাহা থামাইবার সনাতন রীতি চপেটাঘাত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে নীলকমল মাস্টার মহাশয়ের শিক্ষকতা আরম্ভ করিবার পূর্বে যিনি বাড়িতে পড়াইতেন তাঁহার নাম ধাম রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মোহধ্বান্তনাশন উপদেশ এবং উপায় কবির শেষ বয়স পর্যন্ত মনে ছিল। সে সম্বন্ধে পরিহাসসহকারে লিখিয়াছেন :

"যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাত সহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, - এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে। সেই শিক্ষকের নাম ধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত

স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এত বড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।" ১

ছয় বৎসর বয়সে কেবল মাত্র কান্নার জোরেই তিনি ইস্কুলে ভরতি হইলেন। ইস্কুলের নাম ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। এখানে তিনি খুব অল্পদিনই পড়িয়াছিলেন। সেখানকার একটি বিশিষ্ট শাসনপ্রণালীর কথা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার মনে ছিল না।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে বছরখানেক কাটিলে তাঁহাকে নর্মাল স্কুলে ভরতি করান হয়। এই নর্মাল স্কুলে পঠদ্দশার প্রথম দিকটা তেমন মনে না থাকিলেও শেষের দিকটা শেষ জীবনেও তাঁহার সুস্পষ্ট মনে ছিল।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যবহার ভদ্র ছিল না। তাই ছেলেদের সহিত মিশিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন। এমন কি ছুটির সময় তিনি কাহারও সঙ্গে না মিশিয়া একলা বসিয়া থাকিতেন। ইস্কুল-জীবন তাঁহার কাছে কখনো মনোরম বোধ হয় নাই। এই নর্মালস্কুলের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :

> "অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর—আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে।"

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে "গুরুবাক্য" তাঁহার জীবনে অতি শীঘ্রই সার্থক হইয়াছিল।

১ "জীবনস্মৃতি"

এই ইস্কুলের অনেক শিক্ষকের ব্যবহারও তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হইত। এই সময় হরনাথ নামে একজন পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ে পড়াইতেন। ছাত্রদের সহিত ইনি যে ব্যবহার করিতেন তাহা মোটেই সহনোচিত নয়। এই লোকটি কটুভাষায় ছেলেদের গালাগালি দিতেন। রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারেন নাই। হরনাথ পণ্ডিত ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করিলে বালক রবীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তর করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন :

> "সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।"

হরনাথ পণ্ডিত কোনো উত্তর না পাইয়া ভয়ংকর শাস্তি দিতেন। এই নিষ্ঠুর শিক্ষক মাথা হেঁট করাইয়া পিঠকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া বালককে অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। দৃঢ়নিষ্ঠ সত্যাগ্রহীর মতো তিনি ধীরভাবে এই দণ্ড ভোগ করিতেন তবু হরনাথের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতেন না। হরনাথ বুঝিয়া লইলেন, এ ছেলে নিতান্তই গণ্ডমূর্খ, পড়াশুনা ইহার দ্বারা কিছু হইবার আশা নাই।

এইভাবে হরনাথ পণ্ডিতের ক্লাসে এক বৎসর কাটিয়া গেলে বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। যিনি বাংলার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন তাঁহার নাম মধুসূদন বাচস্পতি। ইঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথ সব চেয়ে বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম হইলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া হরনাথ পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিলেন। যে বালকের মুখ দিয়া সারা বৎসরের মধ্যে একটি কথাও তিনি বলাইতে পারেন নাই, সেই বালক পরীক্ষায় প্রথম হইল—ইহা বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি সন্দেহ করিলেন, বাচস্পতি মহাশয়

পক্ষপাত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে বেশী নম্বর দিয়াছেন এবং এই সন্দেহের কথা তিনি কর্তৃপক্ষের নিকটে গোপন রাখিলেন না।

কাজেই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে হইল। এবার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। কিন্তু ফল সমানই হইল। এবারও তিনি সকলের চেয়ে ভাল পরীক্ষা দিলেন। বরং এবারে পূর্ববার অপেক্ষাও অধিক নম্বর পাইলেন।

জীবনস্মৃতিতে হরনাথের নাম উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। হরনাথ পণ্ডিত বালক রবীন্দ্রনাথকে কথা বলাইবার জন্য যে সব নিষ্ঠুর দণ্ড বিধান করিতেন জীবনস্মৃতিতে তাহারও উল্লেখ নাই। ১৩০২ সালে 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে অজ্ঞাত-পূর্ব কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত জীবনীর কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত করিতেছি :

"হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপর হাড়ে চটা ছিলেন; কখনো ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময়ে উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে আবার সোজা দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছেলেটার কিছু হইবে না; কিন্তু যখন বৎসরের শেষে

পরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের (স্মৃতিরত্নের স্থলে বাচস্পতি হইবে। ঐ পত্রিকারই পরবর্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ভ্রম সংশোধন করেন।) নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর দিয়াছেন। যে সারা বৎসরই কিছু পড়ে নাই সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল।' রবীন্দ্রনাথের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সমক্ষে পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ পূবের অপেক্ষাও এবার বেশী নম্বর পাইলেন।"[১]

হরনাথ পণ্ডিতের প্রতি বিরাগ এবং অশ্রদ্ধা তাঁহার একটি গল্পে প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পকে লেখকের জীবনচরিতের অভ্রান্ত উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করা সব সময় নিরাপদ নয় সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু আলোচ্য গল্পটি পড়িলেই বুঝা যায় লেখকের ছাত্রজীবনের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

এই গল্পের নাম 'গিন্নি'। গল্পে যে নিষ্ঠুর শিক্ষকের চরিত্রটি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহার সহিত হরনাথের সৌসাদৃশ্য এত নিকট যে মনে হয়, হরনাথকেই নাম বদলাইয়া বসান হইয়াছে। এমন কি নামও নিশ্চিহ্নরূপে পরিবর্তন করা হয় নাই। হরনাথের নাম যে জানে 'শিবনাথ' নাম দেখিয়া তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইবার কথা নয়।

নর্মাল স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই তিন শ্রেণী নীচে পণ্ডিতি করিতেন হরনাথ। জীবনস্মৃতি এবং 'সখা ও সাথী' হইতেই পাইতেছি হরনাথ রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীতে পড়াইতেন। সেই শ্রেণী হইতে তিনি প্রথম হইয়া

১ 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য

পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ঐ উচ্চতর শ্রেণীও ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী হইতে নিম্নতর শ্রেণী ছিল। কারণ ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে উঠিবার পূর্বেই তিনি নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

'গিন্নি গল্পের আরম্ভে শিবনাথের ছদ্মনামে হরনাথের পরিচয় এইরূপ :

> "ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই তিন শ্রেণী নিচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ।...প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল।"

হরনাথ পণ্ডিতও মারধর এবং গালাগালি উভয়েরই প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন।

গল্পের নায়ক বালক আশুকে শিবনাথ যে শাস্তি দিতেন লেখক বাল্যকালে হরনাথের হাতে ঠিক সেইরূপ শাস্তি পাইয়াছেন। "পণ্ডিত (শিবনাথ) তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নিচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন।"[১]

শিবনাথ পণ্ডিত "মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে না।"

কুৎসিত ভাষা প্রয়োগের জন্য যে রবীন্দ্রনাথ হরনাথের ক্লাসে সংবৎসর কথা বলেন নাই 'সখা ও সাথী'র জীবনী এবং জীবনস্মৃতি হইতে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

নর্মাল স্কুলের পড়া শেষ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথকে ঐ স্কুল ছাড়িতে হয়। ইস্কুল ত্যাগ করিবার মূলে একটি মজার ইতিহাস আছে।

১ 'সখা ও সাথী'তেও এইরূপ শাস্তির উল্লেখ আছে

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি ইংরেজী জীবনচরিত ছিল।[১] নর্মাল স্কুলের জনৈক শিক্ষক বইখানি পড়িতে চান। বইখানি ছিল মহর্ষির কাছে। পূর্বেই বলিয়াছি দেবেন্দ্রনাথকে বাড়ির ছেলেরা সকলেই খুব ভয় করিয়া চলিত। তাঁহার কাছে গিয়া বইখানি চাহিয়া আনে কে?

তিনজন সহপাঠীর মধ্যে সত্যপ্রসাদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা চালাক চতুর সাহসও তাঁহার সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল। স্থির হইল তিনিই এ অসাধ্য সাধন করিবেন। সাহসে ভর করিয়া তিনি তো শেষ পর্যন্ত দাদা-মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সত্যপ্রসাদ ভাবিলেন, মহর্ষির সঙ্গে কথা বলিতে হইলে চলিত ভাষা ব্যবহার করা সংগত হইবে না। তাহাতে হয়তো তাঁহার অমর্যাদা হইবে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "সে (সত্যপ্রসাদ) মনে করিয়াছিল সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল।" তিনি ঠিক কি কথাগুলি বলিয়াছিলেন সে কথা আজ আর কেহ মনে করিয়া রাখে নাই। হয়তো বলিয়াছিলেন:

> "পূজ্যপাদ মাতামহ ঠাকুর, অস্মদীয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ভবদীয় পিতৃদেবের জীবনচরিতপাঠেচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভবৎ সকাশাৎ উক্ত চরিত্রগ্রন্থ প্রার্থনা করিয়াছেন।"

ঠিক এই বাক্যটি না হউক কিন্তু এইরূপ সংস্কৃত মিশ্রিত সাধুভাষাই যে তাঁহার মুখে নির্গত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১ Memoir of Dwarakanath Tagore

সত্যপ্রসাদের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাইয়া দাদামহাশয় তো অবাক। তিনি বুঝিলেন, ছেলেদের "বাংলা ভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।" দৌহিত্র এবং পুত্রদ্বয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বোধ হয় একটু চিন্তিত হইলেন।

সেদিন সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল। পরের দিন সকালে নীলকমল পণ্ডিত-মহাশয় আসিয়া বাংলা জ্যামিতির বই খুলিয়া সবে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে তেতলার ঘরে তিন সহপাঠীর ডাক পড়িল। ছেলেরা উপস্থিত হইলে মহর্ষি বলিলেন, "আজ হইতে তোমাদের বাংলা পড়িবার দরকার নাই।" সেদিন হইতে নীলকমল পণ্ডিত বিদায় লইলেন। নর্মাল স্কুলের পাঠও মধ্যপথেই শেষ হইল।

ইহার পর আরম্ভ হইল বেঙ্গল অ্যাকাডেমির পালা। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভরতি হন এবং হিমালয়ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে আবার এই স্কুলে যোগ দেন।

সাধারণতঃ ফিরিঙ্গি বালকরাই এই ইস্কুলে পড়িত। এখানে স্বাধীনতা ছিল খুবই। কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ কিছুই হইত না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

> "সেখানে কী যে পড়িতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেষ্টাই করিতাম না; না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না।"

বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং নর্মাল স্কুল এই দুই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা বিষয়ে খুব তফাত ছিল। নর্মাল স্কুলের ছেলেদের ব্যবহার ছিল অভদ্র। কিন্তু এখানকার ছাত্ররা অভদ্র ছিল না। ইহারা দুষ্ট হইলেও ইতর ছিল না। ঠাট্টা তামাশা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই বিব্রত করিত

সত্য কিন্তু তাহার মধ্যে ঘৃণ্যতা থাকিত না। এইটা অনুভব করিয়াই রবীন্দ্রনাথ খুব আরাম পাইয়াছিলেন। তাহারা হাতের তেলোয় ইংরেজী ASS শব্দটাকে উলটা করিয়া 'SSA' এইভাবে লিখিত। লিখিয়া আদর করিয়া সেই হাত দিয়া বন্ধুর পিঠে চাপড় মারিত। পিঠে যখন দাগ পড়িত তখন জানোয়ারটি আর উলটা থাকিত না। কখনো বা হঠাৎ দাঁ করিয়া এক চাপড় মারিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যাইত। যেন কোথাও কিছু হয় নাই। হয়তো বা চলিতে চলিতে মাথায় একটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া চম্পট দিল। এ সকল অত্যাচার তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিজনক হইলেও অপমানজনক ছিল না বলিয়া তাঁহার মনকে স্পর্শ করিত না। "এ সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে মনে ছাপ দেয় না,—এ সমস্তই উৎপাতমাত্র, অপমান নহে।"

বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনার জন্য শিক্ষকেরা মোটেই চাপ দিতেন না। অধ্যক্ষমহাশয় ছাত্রগণের নিকট হইতে মাসিক মাহিনাটি নিয়মিতভাবে পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইস্কুলটি ছোট, আয়ও অল্প। যাহারা নিয়মিত বেতন দিতে বিলম্ব করে না এমন সব ছাত্রকে পড়ার কথা বলিয়া চটাইতে তাঁহার সাহস হইত না। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও ইস্কুলের বন্ধন তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। সুবিধা পাইলেই তিন সহপাঠী ইস্কুল হইতে ছুটি লইয়া পলাইতেন। এই পলায়নের কাজ সহজ হইয়াছিল এক মুন্শীর সহায়তায়। কবির দাদারা তাঁহার কাছে পারসী পড়িতেন। পারসী ভাষা তাঁহার সম্ভবত ভালই জানা ছিল এবং ইংরেজীও তিনি মন্দ জানিতেন না। কিন্তু এ বিষয়ে যশোলাভ করিবার কোনো উৎসাহই তাঁহার ছিল না। "তাঁহার বিশ্বাস ছিল লাঠিখেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য নৈপুণ্য সংগীতবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্য পারদর্শিতা।" তাঁহার এই বিশ্বাসের অনুকূল মন্তব্য

প্রকাশ করিলেই তিনি খুশী হইয়া ছুটির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে ইস্কুলপালানো ছেলে এ কথা তিনি স্বয়ং বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন :

"... আমি ইস্কুলপালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি, মাস্টার আমার ভাবীকাল সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।" [১]

রুদ্ধদ্বার শাসনদুর্গে সে মন বদ্ধ থাকিবে কেন ?

"মাস্টারি শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।" [২]

১৮৭৩-এর শেষ কয়টা মাস এইভাবে কাটিলে পর বেঙ্গল অ্যাকাডেমি হইতে সরাইয়া আনিয়া ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বালকদের সেণ্ট জেবিয়ার্স স্কুলে ভরতি করা হইল। এইখানে পড়িবার সময় একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটে। ইস্কুলে নীরদ নামে একটি বালক পড়িত। ফাদার হেনরি নামে একজন অধ্যাপক তখন সেখানে পড়াইতেন। একদিন ফাদার হেনরি নীরদকে তাহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। নীরদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—মেঘ।

অধ্যাপক বলিলেন, কেমন করিয়া হইল ?

১ 'প্রতিভাষণ', পৌষ ১৩৩৮

২ স্কুলপালানে, "আকাশপ্রদীপ"

'নীরদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহার জানা ছিল না। কিন্তু সে ঠকিবার পাত্র নয়, চট্ করিয়া উত্তর দিল, "নী ছিল রোদ নীরদ। অর্থাৎ যাহা উঠিলে রোদ থাকে না, তাহাই নীরদ।"

সেণ্ট জেবিয়ার্স কলেজের দুই একজন অধ্যাপকের কথা তাঁহার চিরকাল মনে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ডি পেনেরাণ্ডা। তাহার সৌম্য ভাবটি বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মুখে যেন একটি পবিত্রতার চিহ্ন মুদ্রিত ছিল।

১৮৭৪ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরা দুই বৎসর এই ইস্কুলে পড়া চলে। ভ্রাতা সোমেন্দ্রনাথ তখনও তাঁহার সহপাঠী। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ইস্কুল যাইতেন না, প্রায়ই কামাই করিতেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে যে শ্রেণীতে তিনি পড়িতেন সেই শ্রেণীকে বর্তমান সময়ের নবম শ্রেণীর অনুরূপ বলা চলে। আর এক বৎসর পড়িলেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই, সোমেন্দ্রনাথ পারিয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে মনে হয় ১৮৭৫-এর শেষ পরীক্ষা তিনি দেন নাই।

যাহাই হউক এখানকার মেয়াদও ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে সমাপ্ত হইল। ইস্কুলের বন্ধন তাঁহার আর কিছুতেই ভাল লাগিল না। ইস্কুলকে তাঁহার জেলখানা বলিয়া মনে হইত। তিনি বুঝিতেন :

> "ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু তবু সে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনো মতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।"

১ 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন, ১৩৪৮

দাদারা কিছুদিন তিরস্কার করিলেন। শেষে কিছু হইবে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। কবির বড়দিদি দুঃখ করিয়া বলিলেন:

> "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।"

আত্মীয়েরা আশা ছাড়িয়া দিলেও পড়াশোনা কম হয় নাই। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বলিতেন, "আগে চাই বাংলা ভাষার গাথুনি তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন।" তিনি যাহা বলিতেন ভাগনে ও ভাইদের বেলায় তাহাই কাজে লাগাইতেন। দেখা গেল তাহার ফল কিছু মন্দ ফলে নাই।

অবসর বিনোদন

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালটা শাসনবন্ধনের মধ্যেই কাটিয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু লেখাপড়া ছাড়া কথা নাই। লেখাপড়ার মধ্যবর্তী অবকাশটা হয় ইস্কুলে নয় চাকরদের ঘরে বন্দীদশায় কাটে। তাই আনন্দ-উৎসবের অবসর খুব অল্পই তিনি পাইতেন।

খেলাধুলার বৈচিত্র্য সেকালে খুব কমই ছিল। মার্বেল চালাইয়া ব্যাটবল ঠুকিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া এবং লাটিম ঘুরাইয়াই সে যুগের বালকদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। টেনিস ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়ঝাঁপের খেলা তখনও বিদেশ হইতে আমদানি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বিশেষ চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন না। সেটুকু খেলা ছেলেরা খেলিত তাহাতেও তিনি যে সর্বদা যোগ দিতেন এমন নয়। অভিভাবকগণ পড়াশুনার যে বিস্তারিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে খেলাধুলার কোনও আয়োজন ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে যিনি শাসনকর্তা ছিলেন সেই সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথও খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা কখনও চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। অথচ স্বাস্থ্যচর্চার দিকে সকলের দৃষ্টি ছিল অব্যাহত। সকালে কানা পালোয়ানের কাছে কুস্তিশিক্ষা এবং বিকালে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া প্যারালালবারে ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ব্যায়াম এক জিনিস, খেলাধুলা আর। খেলাধুলার সঙ্গে তাহার যদি কোনও মিল থাকে তো সে নিতান্তই আংশিক। কাজেই বালকের দিনগুলি নিতান্ত একঘেয়ে কাটিয়া যাইত। সেই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন :

"এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে। ··· শুকনো পাতার সঙ্গে

এক জাতের ফড়িং যেমন বেমালুম রং মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।"

এই নীরন্ধ্র অন্ধকার দিনগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে কখনও কখনও একটু আধটু আলো পড়িত যখন ভালুকওআলা ভালুক নাচাইতে আসিত, সাপুড়ে আসিত সাপখেলা আর বাজিকরের দল আসিত ভোজবাজি দেখাইতে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে ডাকাতির খেলাও হইত।

তখনকার দিনে শখের যাত্রার খুব চলন ছিল। পেশাদারী যাত্রার দলেরও অপ্রতুল ছিল না। ঠাকুরবাড়িতে মাঝে মাঝে যাত্রাগান হইত। কিন্তু ছেলেদের যাত্রা শোনার হুকুম ছিল না। সব বিষয়ে মানা করাই ছিল বড়দের ধর্ম। শিশুমনের কৌতূহল সম্বন্ধে তাঁহাদের ছিল নির্মম ঔদাসীন্য। যাত্রা আরম্ভ হইত রাত করিয়া। সন্ধ্যা হইতে আসরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে, জোগাড়যন্ত্র চলে, দেউড়ির খোল দরজা দিয়া লোকজন ভিড় করিয়া উঠানে ঢুকে। এইভাবে যাত্রার ভূমিক চলে। কিন্তু ভূমিকা শেষ হইবার পূর্বেই বালকের বাহিরে থাকিবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। নয়টা বাজিতে না বাজিতেই শ্যাম আসিয়া শুইবার জন্য টানিয়া লইয়া যায়। দীপোজ্জ্বল গীতবাদ্যমুখরিত যাত্রাসভার আভাস ভাসিয়া আসে বালকের নীরব নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকার শয়নকক্ষে। সেই দুঃখদিনের উল্লেখ আছে ছেলেবেলায় :

> "বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন, আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিমটিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল শমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।"

এই বহু আকাঙ্ক্ষিত যাত্রাগান শোনারও অনুমতি একবার মিলিয়া

গেল। সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত যে শুনিয়া তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই পারেন নাই। সেদিন ছিল নলদময়ন্তীর পালা। যাত্রা আরম্ভ হয় রাত এগারটায় কিন্তু এগারটা পর্যন্ত জাগিয়া থাকা শক্ত কথা। তাহা ছাড়া মা নিজে আশ্বাস দিলেন যাত্রা আরম্ভ হইলে তিনি জাগাইয়া দিবেন। এই ভরসায় নয়টার সময় শুইতে গেলেন। ঘুম যখন ভাঙান হইল তখন আসর একেবারে জমজমাট। সভাস্থলের একধারে বাড়ির কর্তা এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বসিয়াছেন অবশিষ্ট জায়গাটায় অন্যান্য লোকের ভিড়। সদ্য নিদ্রোত্থিত বালক দাদাদের কাছে আসিয়া বসিলে তাহারা কিছু কিছু টাকা রুমালে বাঁধিয়া ভাইয়ের হাতে দিলেন। অভিনয়ের মাঝখানে যেখানে বাহবা দিবার কথা সেখানে ঐ টাকা ছুঁড়িয়া দেওয়া ছিল সেকালের রীতি। এই টাকা দেওয়ার অধিকার পাইয়া বালকের মনে সেদিন প্রবীণত্বের যে অহংকার জাগিয়াছিল বৃদ্ধবয়সেও সেকথা ভুলিতে পারেন নাই।

যাত্রা বেশীদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসিল। ভৃত্যরা কখন যে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া মায়ের খাটে শোয়াইয়া দিয়া আসিল তাহা জানিতেও পারিলেন না। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিলে দেখিলেন মায়ের তক্তপোশে শুইয়া আছেন। জীবনে এই একটি দিনের কথা তাঁহার মনে আছে যেদিন প্রাতরুত্থানে পৃথিবীর রবি আকাশের রবির কাছে হার মানিয়াছেন।

জীবনে খেলার অভাব ছিল বলিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের মনে নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও প্রতিভার সুসম্পূর্ণ আলোচনার পক্ষে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মূল্য এখনও বোধ হয় স্বীকৃত হয় নাই। মনুষ্যজীবনের অতীতকালের সঙ্গে ভবিষ্যৎকালের একটি অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে এ কথা যদি মানিয়া লই তবে মানবের

পরিণত বয়সকে জানিতে হইলে অপরিণত বয়সকেও গণনার বাহিরে রাখা চলে না ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

বাল্যকালে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যে রহস্য মনের মধ্যে সকৌতুক কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে এবং যে প্রথম জাগ্রত কৌতূহল চরিতার্থতা লাভের জন্য পরবর্তী জীবনে পথ খুঁজিয়া বেড়ায় ছেলেমানুষের ছেলেখেলার মধ্যেই তাহার অঙ্কুরোদ্গম—এই কথাটি বিশেভাবে স্মরণীয়।

প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য বালক রবীন্দ্রনাথের মনে যে কৌতূহলের সঞ্চার করিত তাঁহার একটি খেলার মধ্যে তাহার নিদর্শন পাই। দোতলার বারান্দায় যেখানে পড়ার স্থান নির্দিষ্ট ছিল তাহারই এক কোণে পাথরের নুড়ি দিয়া কৃত্রিম পাহাড় তৈয়ার করা এবং ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেই পাহাড়ের শোভা বর্ধন করা তাঁহার এক খেলা ছিল। এই পাহাড়ে একদিন তিনি আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতে আরম্ভ করিলেন। এবং প্রতিদিন সকালে উঠিয়া তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এই আতার বিচি হইতে যে একদিন গাছ জন্মাইতে পারে এ কথা ভাবিয়া বালকের মনে তখন বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না।

“আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল
দেখব বলে মনে বিষম ছিল কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়,
দোতালাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলো বালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে ভেবেছিলুম ভোরে।”[১]

১ “ছড়ার ছবি”

অবশ্য গাছ দেখা দিবার পূর্বেই সেই ধুলাবাড়ির পাহাড় পর্বত গুরু-জনদের আদেশে অন্তর্ধান করিয়াছিল। সে দুঃখ বালকের মনে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত দিয়াছিল।

গাছপালা সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ছিল প্রবল। তাই প্রোফেসর উপাধি দিয়া যে জাদুকর বন্ধু ম্যাজিক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল তাহার নির্দেশমত একবার আমের আঁঠির উপর মনসাসিজের আঠা লাগাইয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ তৈয়ার করিবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সে আমের আঁঠিও যে আতার বিচির মতই নিরঙ্কুর অবস্থাতেই বিসর্জিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রোফেসর বন্ধু এবং সত্যপ্রসাদের মাথায় অবসর বিনোদনের নব নব পরিকল্পনার উদয় হইত। একবার তাঁহারা স্থির করিলেন বাড়িতে স্টেজ বাঁধিয়া কোনো নাটক অভিনয় করিবেন। রবীন্দ্রনাথকেও তাঁহারা দলে লইলেন। বালকেরা কঞ্চি পুঁতিয়া লাল নীল কাগজ লাগাইয়া একটা স্টেজও খাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুজনদের দৃষ্টি পড়ায় সে স্টেজও ধুলাবালির পাহাড়ের ন্যায় অদৃশ্য হয়।

বাল্যকালে তিনি এক খেলার সঙ্গিনী পাইয়াছিলেন। সেই বালিকা মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে রাজার বাড়ির গল্প বলিয়া চমৎকৃত করিয়া দিত। তাহার 'রাজপুরী' ঠাকুরবাড়ির মধ্যেই নাকি কোন্ এক জায়গায় অবস্থিত ছিল এবং বালিকা নিজেও সেখানে যাতায়াত করিত। একথা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। সঙ্গিনীর কাছে তিনি শুনিয়াছেন সে এক আশ্চর্য স্থান। "সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য, খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ।" তিনি নিজে কখনও সেখানে যাইতে পারেন নাই। সঙ্গিনীও কখনও তাঁহাকে সেখানে লইয়া যায় নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, বাড়ির সকল ঘরই তো দেখিয়াছেন তবে সে রাজা ও রাজপুরী দেখিতে পান নাই কেন? বিস্ময় বোধ করিয়াছেন তবু অবিশ্বাস করেন

নাই। বালকের চিত্তলোকে অসম্ভবের স্থান নাই। জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিন মনে জাগিত।"

সেই অতি নিকটের অদৃশ্য রাজপুরার অদৃশ্য রাজাই হয়তো কবির পরিণত বয়সে "রাজা" নাটকে অদৃশ্য ভাবে নায়কত্ব করিয়াছেন।

বড় ও ছোটর মধ্যে যে শাসনপীড়নের সম্বন্ধ ছাত্রশিক্ষকের সম্বন্ধটা তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে মধুরতর তো ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর নিষ্ঠুর ছিল। শিক্ষকদের ব্যবহারে বালকের মনে যে প্রতিকার-হীন ক্ষোভের উদয় হইত নিজের উদ্ভাবিত একটি খেলার মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন :

"শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।"

ছাত্র হইয়া থাকিবার এই যে হীনতা তাহা মিটাইবার জন্য তিনি নিজে মাস্টার-মাস্টার খেলা আরম্ভ করিলেন। বারান্দার একটা কোণে তাঁহার শিক্ষকতা আরম্ভ হইল। সজীব মনুষ্যশিশুর অভাবে কাঠের রেলিংগুলাকেই তিনি ছাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেন। চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া একটি যষ্টি সহযোগে ক্রমাগত তাহাদের পৃষ্ঠদেশে 'মাস্টারি' করিতে লাগিলেন। তাহাতে "তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত।" এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :

"কিন্তু যদিচ রেলিং শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।"

সত্তর বৎসর বয়সে রচিত একটি কবিতার মধ্যেও শৈশবের মাস্টার-মাস্টার খেলার কথা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে :

"উপরে যাবার সিঁড়ি
তারি নিচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ মহলে
. . . .
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে
সেটাই আমার ছাত্র ছিল
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।" [১]

শিশুমনে গুরুমশায়গিরির অনিবার্য প্রলোভন "শিশু" গ্রন্থের দুই একটি কবিতায় কেমন নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় :

"আমি আজ কানাই মাস্টার
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি

[১] উদ্ভিদ, "পুনশ্চ"

আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।"[১]

রেলিঙের মাস্টারি সম্পর্কে বলিয়াছেন :

"সুখের বিষয় এই যে কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক ও অচল পদার্থ ছাড়া আর কিছুর উপর সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার ছিল না।"[২]

তখন সে উপায় ছিল না বলিয়া প্রয়োগ করেন নাই কিন্তু বেশী বয়সে বুঝিয়াছেন উপায় থাকিলেও প্রয়োগ করা অমানুষের আচরণ। তখন লিখিলেন

"আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।"

"বিজ্ঞ" কবিতাটিতেও মাস্টার-মাস্টার খেলার কথা আছে কিন্তু শাসনের কথা নাই :

"সামনেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি খুকী পড়া করো,
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে
তোমার খুকীর পড়া কেমনতরো ;
ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্চা গাধা,
আমি বলি, "আমি গুরুমশাই
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা' !"[৩]

১ মাস্টারবাবু, "শিশু"
২ "জীবনস্মৃতি"
৩ বিজ্ঞ, "শিশু"

শিশুকবির আর একটি খেলা ছিল—কাঠের তৈয়ারী এক সিংহ লইয়া পূজা পূজা খেলা। অন্যত্র সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি।

শিশুকালে খেলার উপকরণ কম ছিল বলিয়াই কল্পনা খেলাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন বেশী। নির্জন ছাদ, অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র বাগান, পরিত্যক্ত গোলাবাড়ির ভগ্নাবশেষ, বিগতমহিমা ঠাকুরমার আমলের পালকি এই সব ছিল তাঁহার সেই কল্পনার সঙ্গী। প্রথম বয়সের বালককে সান্ত্বনা দিয়া পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন

> "বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপর সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দ লাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।"

শাসন বন্ধনের অবরোধ হইতে বালককে যিনি মুক্তি দেন সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা রবীন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়াছেন। ইনি বালককে বালক বলিয়া মনে করিতেন না, কনিষ্ঠের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে তাঁহার বাধিত না। শুধু সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় নয় আমোদ উৎসবেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছোট ভাইকে সঙ্গে লইতেন। জমিদারির কাজে তাঁহাকে মাঝে মাঝে শিলাইদহে যাইতে হইত। একবার তিনি বালক ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তখনকার

কালে বালকের সহিত এইরূপ অসংকোচ ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন কখনও বাঁধারীতির কাটা খালে চলিতে অভ্যস্ত ছিল না। তিনি সেই সেকালে স্ত্রীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইতেন। এমন সাহসও তাঁহার ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই শিলাইদহে আসিয়া বালক ভ্রাতাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। ঘোড়াটা দৌড়াইতও খুব। কিছুমাত্র খেলাধুলার সঙ্গে যাঁহার যোগ ছিল না শিলাইদহে এবড়ো খেবড়ো মাঠে সেই শান্ত শিষ্ট বালকটি যখন ঘোড়া ছুটাইতে আরম্ভ করিলেন তখন মনে ভয় হয় নাই এমন নহে কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। পরে এই জ্যোতিদাদাই তাঁহাকে কলিকাতার রাস্তাতেও ঘোড়ায় চড়াইয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিকার করিতে ভাল বাসিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদার সহিত শিলাইদহে থাকিবার কালে একবার সংবাদ পাওয়া গেল জঙ্গলে বাঘ আসিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক বাগাইয়া শিকারে চলিলেন, রবীন্দ্রনাথকেও লইলেন সঙ্গে। এইরকম বেপরোয়া সাহস ছিল তাঁহার। সঙ্গে ছিল একজন শিকারী, নাম বিশ্বনাথ। বনের মধ্যে একটা মোটা বাঁশগাছের কঞ্চি কাটিয়া মইয়ের মতো তৈয়ার করা হইয়াছে। মাচানের উপর চড়িয়া বাঘ মারাতে পৌরুষের পরিচয় অল্প, তাই এই ব্যবস্থা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ সহোদরকে লইয়া সেই বাঁশের মইয়ে উঠিলেন। বিশ্বনাথের ইশারায় ঝোপের দিকে চাহিতেই দেখা গেল বাঘের গায়ের ডোরা কাটা দাগ। সেই দাগ লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দুক ছুঁড়িলেন, গুলিটা লাগিল বাঘটার শিরদাঁড়ায়।

ইহার পরও একবার হাতীর পিঠে চড়িয়া রবীন্দ্রনাথ ঐ দাদার সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকারে যাত্রা করেন। সেবারও বাঘের দেখা

পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু শিকারীর গুলি লাগিবার পূর্বেই সে ঝড়ের বেগে ছুটিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। রৌদ্র ঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সেই ছুটন্ত বাঘকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন একটা "বজ্রওআলা ঝড়ের ঝাপটা।"[১]

শিকারের গল্পে মনে পড়ে আর এক দিনের কথা। তখন বয়স হইবে এগার বৎসর কয়েক মাস। বার পূর্ণ হয় নাই। উপনয়নের পর পিতার সহিত বোলপুরে গিয়াছেন। সেখানে এক মালী ছিল নাম হরিশ মালী। হরিশ মালী একদিন তাঁহার কাছে খরগোশ শিকারে যাত্রার প্রস্তাব করিল। বালক খুব উৎসাহের সঙ্গেই সম্মত হইলেন।

সুরুল গ্রাম শান্তিনিকেতন হইতে মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত, তাহারই পাশে চিফ সাহেবের কুঠির ভগ্নাবশেষ লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। এই স্থানটিকেই হরিশ মালী মৃগয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। সুদূরপ্রসারিত জনবিরল প্রান্তরের মধ্যে এই ভগ্নজীর্ণ পুরাতন বাড়িটির দিকে তাকাইয়া তাঁহার কি যে মনে হইল কে বলিবে? তিনি কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। শিকারের কথা আর মনে রহিল না।

এমন সময় হঠাৎ ঝোপের মধ্য হইতে একটি খরগোশ বাহির হইয়া দৌড় দিল। বালকের স্বপ্নাবেশ ভাঙিবার পূর্বেই হরিশ মালীর অব্যর্থ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র প্রাণীর দৌড় চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল। শিকারের পূর্বে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল শিকারের বীভৎস নিষ্ঠুরতায় তাঁহার সে উৎসাহের তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

হরিশ মালী যখন তাহার রক্তাক্ত শিকারটি কাঁধে ঝুলাইয়া বিজয়গর্বে

১ "ছেলেবেলা"

ফিরিতেছিল, দীর্ঘ পথ তাহার অনুবর্তন করিতে করিতে বালকের মন করুণ ক্রন্দনে ভরিয়া উঠিল। [১]

বাঘ শিকার দেখিয়া যাঁহার মন করুণায় আর্দ্র হয় নাই নিরীহ ক্ষুদ্র জীবের প্রাণসংহারে তাঁহার হৃদয় বেদনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। হিংস্র জীবকে আঘাত করিবার মধ্যে যে পৌরুষের প্রকাশ আছে একটি খরগোশ বা একটি পাখী শিকার করায় তাহা নাই। তাই নিরীহ প্রাণী শিকার করিতে দেখিলে তাঁহার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত, "যোগাযোগ" উপন্যাসের মধুসূদনের পাখী শিকারের কাহিনী এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।[২]

খরগোশ শিকারের এই করুণ ঘটনার পরও তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত শিকারে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ছিল অহিংস্র শিকার। এবং তাহার ক্ষেত্র ছিল কলিকাতার প্রান্তবর্তী প'ড়ো বাগান। জীবনস্মৃতিতে এই শিকারকাহিনীর উল্লেখ আছে :

> "রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন।...শিকারের জন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুর মাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না।"

১ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ দ্রষ্টব্য

২ খরগোশ শিকারের প্রসঙ্গে কবি শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেন : "বালককালে চিক সাহেবের ভাঙা কুঠিতে খরগোশ শিকারের নিদারুণতা চিরকালের মতো আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে।" 'প্রবাসী', পৌষ ১৩৩৮ দ্রষ্টব্য

বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঠ

যে চাকরদের শাসনে শৈশবের দিনগুলি কাটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে তাহাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাহারা পেটের খোরাক কম করিয়া দিত, সকলে শুধু এই কথাই জানে : কিন্তু সে ক্ষতি যে তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অন্যভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিল সে কথা আমরা স্মরণ করিয়া দেখি না।

ভৃত্য ব্রজেশ্বরের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঠাকুরবাড়িতে চাকরি লইবার পূর্বে সে গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয় ছিল। গুরুগিরির খানিকটা সে নূতন কর্মস্থলেও বজায় রাখিয়াছিল। চাকরদের বৈঠকে সন্ধ্যাবেলা যে সভা বসিত ব্রজেশ্বর ভূতপূর্ব পদগৌরবের অধিকারে স্বভাবতই তাহার সভাপতি হইয়া বসিল।

বৈঠকে ব্রজেশ্বর রামায়ণ মহাভারত পড়িত। চাকরদের মধ্যে দুই চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহপাঠীরা শিশুকালে এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাঁহারা উৎসুকচিত্তে শুনিতেন।

"শৈশবকাল হইতেই ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালোবাসিতেন। বাড়ির একজন পুরাতন চাকর সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিত, আর রবীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন।"[১]

সুদূর বাল্যকালের সেই রহস্যময় দিনগুলির কথা মনে করিয়া কবি লিখিয়াছেন :

"ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত,

১ "বঙ্গভাষার লেখক"

টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর-বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও মনে পড়ে।"

কাব্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রকথাও উঠিয়া পড়িত। পুরাণের কোনো কথা লইয়া হয়তো শ্রোতারা প্রশ্ন উত্থাপন করিত, কেহ বা উত্তর দিত। কিন্তু তর্ক বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইত না। সভাপতি ব্রজেশ্বর সুগভীর গাম্ভীর্যের সহিত সব সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিত।

ব্রজেশ্বরের রামায়ণ পাঠ শেষ হইতে না হইতে আসিতেন মহর্ষির অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে। তিনি পাঁচালি গাহিয়া সভার কার্যে সুর সংযোগ করিতেন।

> "ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হুহু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা।" [১]

এই কিশোরী চাটুজ্যের একটি সুন্দর চিত্র কবির একটি আধুনিক কবিতায় চিত্রিত হইয়াছে :

> "কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,
> বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো চাদর কাঁধে ঝোলে।

১ "ছেলেবেলা"

দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা পড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।" ১

চাকরদের মহলে পড়াশোনার চর্চা কম ছিল না। রামায়ণ মহাভারত এবং চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ এইগুলিই ছিল তাহাদের প্রধান পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদের নিকট হইতে লইয়া এই বইগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তোশাখানার নির্জন কারাবাসের দুঃখ তিনি এইভাবে কাব্যপাঠের দ্বারা বিস্মৃত হইতেন। চাকরদের মহলেই যে তাঁহার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ হয় একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন :

"চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।"

রামায়ণ কাব্য তাঁহার কবিজীবনে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা জানি। রামায়ণের কাহিনী তাঁহার অসংখ্য রচনায় নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই মহাকাব্য এবং ইহার মূল রচয়িতা আদি কবি বাল্মীকি তাঁহার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন। রামায়ণের প্রতি এই যে অনুরাগ ইহার সূত্রপাত হয় শিশুকালেই।

কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ একদিন বিকাল বেলায় 'পুলিসম্যান

১ বালক, "ছড়ার ছবি"

পুলিসম্যান' বলিয়া ডাকিয়া বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুলকে কি কারণে ভয় দেখাইয়াছিলেন। মাতুলের বয়স তখন ভয় করিবারই বয়স, বছর সাতেকের বেশী হইবে না। তিনি ভয় পাইয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া মায়ের কাছে আসন্ন বিপদের কথা জানাইলেন কিন্তু তাঁহার মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। মাতার এইরূপ ঔদাসীন্য সত্ত্বেও বাড়ির বাহিরে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ বোধ হইল না। বিকালের খেলাধুলা অসমাপ্ত রহিল, তিনি রামায়ণ পাঠে মন দিলেন। রামায়ণ পাঠের সেই চিত্রটি জীবনস্মৃতি হইতে তুলিয়া দিতেছি :

> "দিদিমা—আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়া—যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেল কাগজ মণ্ডিত কোণছেঁড়া মলাটওআলা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা, সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোন্ এক করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।"

এইভাবে অতি অল্প বয়সেই রামায়ণ সম্পূর্ণ পড়া হইল। রামায়ণের কাব্যরসে বালকের মন অভিষিক্ত হইল। রামায়ণের আখ্যানভাগ তাঁহার একান্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। শ্যাম ঘরের মধ্যে যে গণ্ডি আঁকিয়া যাইত বালক রবীন্দ্রনাথ সে গণ্ডির বাহিরে যাইতে সাহস করিতেন না। লক্ষ্মণের গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া সীতার যে গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল সেই কথা তাঁহার মনে পড়িত। রামায়ণের কাহিনীই বালকের কল্পনায় হয়তো একদিন নব রামায়ণের সূত্রপাত করিয়াছিল। বেশী বয়সে সম্ভবত সেই বাল্য-

স্মৃতিই 'বনবাস' কবিতায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হয়তো সেই পুরাতন পালকির মধ্যেই তাহার সূচনা হইয়াছিল :

"বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবছ মনে।
চোদ্দ বছর কদিনে হয়
জানিনে মা ঠিক,
দণ্ডক বন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করিনে তাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখন বাংলা বই বেশী ছিল না। যে কয়খানা বই মুদ্রিত ছিল তাহার একটাও বোধ করি তিনি পড়িতে বাকী রাখেন নাই। আজকাল শিশুপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ছেলেদের জন্য যে সব বই রচিত হয় সেকালে সে রকম বই বাজারে ছিল না। "তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই।" রবীন্দ্রনাথ বলেন ইহাতে তাঁহাদের পক্ষে কোনও ক্ষতি হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"...বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।...আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে

১ বনবাস, "শিশু"

বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না, দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।"

তখন দীনবন্ধু মিত্রের একটি প্রহসন বাহির হইয়াছে—নাম "জামাই-বারিক"[১]। কবির কোনও আত্মীয়া ঐ বই একখানি আনাইয়া পড়িতে-ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল বইটি পড়েন, কিন্তু যাঁহার বই তিনি উহা বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিতেন। বালকের অনুনয় বিনয়ে তিনি কান দেন নাই।

পড়ার আগ্রহ দমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সুতরাং তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ আত্মীয়াটি মধ্যাহ্নে ঘরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন। খেলাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সেই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আঁচলের গোছা হইতে চাবিটি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাঁচা হাতের কাজ—ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন অঞ্চলের অধিকারিণী অঞ্চলকে পৃষ্ঠদেশ হইতে নামাইয়া কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

ইহাতেও তাঁহার পাঠস্পৃহা মন্দীভূত হইল না। তিনি তখন অন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। কোথা হইতে কয়েকটা পান ও কিছু দোক্তা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাসের আড্ডায় ঐ মহিলার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এই পান দোক্তা আনার মধ্যে একটা গূঢ় মতলব ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, তাঁহার দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস ছিল—এবং দোক্তা খাইলেই পিক ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে।

কৌশল ঠিক খাটিল। আত্মীয়াটি পান খাইয়া পিক ফেলিতে উঠিলেন। আসিয়া যখন পুনরায় খেলার আসনে বসিলেন তখন পিঠের আঁচল আর

১ ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত

কোলে রাখিবার কথা মনে রহিল না। এবার চাবি অপহরণ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। এবং "জামাইবারিক" শেষ হইতেও বিলম্ব ঘটিল না।

১২৫৮ হইতে ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র বাহির হইত। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের আলমারির মধ্যে এই পত্রিকার বাঁধান এক ভাগ ছিল। ছুটির দিনের অনেকগুলি মধ্যাহ্ন তিনি এই বই পড়িয়া কাটাইয়াছেন।

আর একটি পত্রিকা তখন ছিল, তাহার নাম 'অবোধবন্ধু'। দ্বিজেন্দ্র-নাথের আলমারিতে ইহার অনেকগুলি খণ্ড ছিল। সেগুলিও কবির প্রথম সাহিত্যপিপাসা নিবারণের অন্যতম উপায় ছিল।

জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন :

"এই কাগজেই বিহারী লাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়া-ছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মনোহরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।"

এই পত্রিকায় ভাষান্তরিত গল্পও প্রকাশিত হইত। "পৌল বর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ" এই পত্রিকা হইতে তিনি পড়িয়াছিলেন।[১]

তাহার পর বাংলা সাহিত্যে নব যুগের সূত্রপাত করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার বঙ্গদর্শন বাঙালীকে নূতন আনন্দের সন্ধান দিল। বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র এগার বৎসর। এই বয়সেই যেরূপ ঔৎসুক্য লইয়া তিনি এই পত্রিকা পড়িতেন তাহার পরিচয় এই কয়টি পংক্তি হইতে পাওয়া যাইবে :

১ "Paul and Virginia translated from French and reproduced in Bengali in the pages of Abodha-bandhu," P. R. Sen, "Western Influence in Bengali Literature."

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।"

এই সকল পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা তাঁহার নির্ধারিত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শিক্ষক মহাশয়ের কাছে এসব পড়িতে হইত না। বরং ইহার মধ্যে কোনও কোনও বইএর নাম করিলে শিক্ষক মহাশয় হয়তো ক্রুদ্ধই হইতেন। এগুলি ছিল তাঁহার চিত্ত বিনোদনের উপায়।

এই সময়ে তিনি আর একটি 'লোভের সামগ্রী' পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। সেটি হইল সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ। এই সংগ্রহপুস্তক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় বার বৎসর। এই কাব্যসংগ্রহের খণ্ডগুলি বাড়িতে নিয়মিত আসিত কিন্তু গল্প উপন্যাসের মত ইহার নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা বেশী ছিল না। তাই এগুলি তিনি জড় করিয়া আনিয়া সকৌতুক আগ্রহে পড়িতেন।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে প্রাচীন কবিগণের রচনা সংকলন করিয়া প্রকাশ করা হইত। এইসব রচনার মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলীও ছিল। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। তাঁহার রচনার ভাষা বাংলা নয়, মৈথিলী। বাংলাদেশে

অত্যধিক প্রচলনের ফলে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষা বাংলার সহিত মিশিয়া এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ভাষাকে ব্রজবুলী নামে অভিহিত করা হয়। বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে অনেকে এই কৃত্রিম ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের বঙ্গীয় রূপান্তরগুলি পড়িয়া বোঝা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু সহজ ছিল না বলিয়াই এগুলি তাঁহার মনোযোগ বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিত। তিনি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধির দ্বারাই এগুলির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে তিনি অর্থ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করিতেন। দুরূহ শব্দগুলি যেখানে যতবার ব্যবহার হইয়াছে তাহা টুকিয়া রাখিতেন, ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও নোট করিয়া রাখিতেন। শেষ পর্যন্ত ব্রজবুলী তাঁহার এমনই আয়ত্ত হইয়া গেল যে, এই ভাষাতে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কবিতাগুলি ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা দেখিয়া তাহা যে প্রাচীন কবির নয়, এ সন্দেহ পর্যন্ত কাহারও মনে উদিত হয় নাই। সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

সাহিত্যিক পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের যে বাড়িতে জন্ম হয় সে বাড়ির আবহাওয়াটাই ছিল এক রকম। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,

> "ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।"

ঠাকুরবাড়ি ছিল তদানীন্তন বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে, নাটক রচনা করাইয়া তাহার অভিনয় চলিতেছে, বড় বড় গায়ক আসিয়া সংগীতের আসর জমাইতেছেন, দেশের উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে। বেশে ভূষায়, কাব্যে গানে, চিত্রে নাট্যে সকল দিক দিয়াই ঠাকুর পরিবার একটা নূতনত্ব আনিয়া দিতেছিলেন। এমন কি ইঁহাদের কথার ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যেও যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কবি সত্তর বৎসর বয়সে শিশুকালের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন :

> "এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল ·· মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুর স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।"[১]

তখনকার বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইংরেজী ভাষারই প্রভাব ছিল অধিক। সভাসমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুগোষ্ঠী পর্যন্ত

১ 'প্রতিভাষণ'

ইংরেজীরই ছিল একাধিপত্য। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মধ্যে এই বর্বরতা প্রবেশ করিতে পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি,—চিঠিপত্রে লেখাপড়ায় এমন কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।" [১]

এই প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে এই যে বাংলা ভাষার প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় ইহা সাময়িক ফ্যাশনমাত্র ছিল না। ইহার মধ্যে একটি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। স্বদেশের ভাষার প্রতি এই যে অনুরাগ স্বদেশ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন ছিল না—বস্তুত ইহাকে স্বদেশপ্রেমেরই আংশিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষায় দুই চারিটা চিঠি লিখিয়া যাঁহারা বাংলাকে কৃতার্থ করিলেন বলিয়া বোধ করেন এ পরিবারের লোকেরা সেরূপ মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না।

১ 'প্রতিভাষণ'

বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা ইঁহাদের কাছে প্রত্যবায় বলিয়া গণ্য হইত।

গৃহের এই প্রভাবটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কি গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা যায় না। অন্যের অন্ধ অনুকরণকে তিনি অপমানজনক মনে করিতেন। পরিণত বয়সে দেশকে এই অপমান হইতে মুক্তি দিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যে কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে সেকালের সহিত তুলনা না করিলে তাহা সহজে বোঝা যাইবে না। প্রবন্ধে গল্পে উপন্যাসে, কখনও গম্ভীর উপদেশে কখনও বা সুতীব্র বিদ্রূপে এই পরানুচিকীর্ষার মোহপাশ হইতে বাঙালীর মনকে তিনি সবলে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার যৌবনকালেও তিনি দেখিয়াছেন রাজনৈতিক সভায় পর্যন্ত দেশী ভাষা আমল পাইত না। বড় বড় স্বদেশী নেতারা বিদেশী ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স হইতেই এই রীতির পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ইহার প্রতিবাদ করিয়া ইংরেজীর স্থলে বাংলার চলন করেন। দেশীয় সভাস্থলে বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে 'রাজটিকা' গল্প উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরপরিবারে যেমন বাংলার তেমনি ইংরেজীরও চর্চা ছিল। একদিকে যেমন বাংলা কাব্য বাংলা নাটক বাংলা সংগীতের অনুশীলন চলিতেছিল তেমনি অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের "গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌সপীয়রের নাট্যরসসম্ভোগে আন্দোলিত, আর ওআলটার স্কটের প্রভাবও প্রবল।" এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছিলেন। তাই ইস্কুল পালাইয়াও তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় নাই। অনেকটা বাড়ির গুণেই তিনি বড় হইতে পারিয়াছিলেন।

বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিশেষ চর্চা ছিল। মহর্ষির প্রবর্তিত ধর্মসাধনার মধ্যে ভাবাবেগের উদ্বেলতা ছিল না। উপনিষদের উপরেই ছিল সে ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ঠাকুর পরিবারে উপনিষদের আলোচনা বহুল ভাবেই হইত। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রায় প্রতিদিনই উপনিষদ আবৃত্তি করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।"

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বাড়িতে মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিতে তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অনিচ্ছুক ছাত্রের সূত্র সবগুলি মুখস্থ হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে পারি নাই কিন্তু ব্যাকরণশিক্ষা যে অসম্পূর্ণ ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। কারণ, প্রথম বয়সের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া সুকুমারমতি বালক বালিকার জন্য পরিণত বয়সে তিনি নিজেই সহজপাঠ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এই ব্যাকরণের নাম ছিল "সংস্কৃত শিক্ষা", ইহা দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

নীলকমল ঘোষাল এবং হেরম্ব তত্ত্বরত্ন বিদায় হইলে পর বাড়িতে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিতেন তাঁহাদের একজনের নাম রামসর্বস্ব। এই রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় প্রথমত তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যাকরণ পাঠে যখন কিছুতেই তাঁহার মন বসাইতে পারিলেন না তখন তিনি একেবারে সংস্কৃত সাহিত্য ধরাইয়া দিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতে লাগিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা বাল্য বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে

১ "রবীন্দ্র রচনাবলী", অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আকর্ষণ করিয়াছিল। "প্রাচীন সাহিত্যে" 'শকুন্তলা' 'কাব্যের উপেক্ষিতা' 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধের মধ্যে ভারতের মহাকবির শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় কিরূপ আন্তরিকতার সহিত কিরূপ গভীর অনুভূতির সহিত এই গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন।

এদিকে রামসর্বস্ব যখন শকুন্তলা পড়াইতেছিলেন তখন আর একদিকে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কুমারসম্ভব ধরাইয়া দিয়াছেন। "প্রাচীন সাহিত্যে" এই কাব্যেরও আলোচনা আছে।

বাল্যকালে শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব পাঠ করিয়া তিনি যে কাব্যরস আস্বাদ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে কালিদাসের প্রায় সব এবং অন্যান্য বিখ্যাত কবির কাব্য পাঠ করার ইচ্ছা স্বভাবতই মনে জাগরূক হইল। সংস্কৃতভারতী অনুরক্ত সেবকের সম্মুখে ভাণ্ডারদ্বার খুলিয়া ধরিলেন, ভক্ত বাছিয়া বাছিয়া শ্রেষ্ঠ রত্নকয়টি তুলিয়া লইলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির সহিত পরিচিত হইবার পূর্বেই মেঘনাদবধকাব্য তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। বাংলা মহাকাব্যের সহিত তুলনায় সংস্কৃত মহাকাব্যের ভাব ভাষা ছন্দ এবং বিষয়বস্তু সকল দিক দিয়া এতই সুন্দর মনে হইল যে মেঘনাদবধকে তিনি মহাকাব্য নামের অযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। কাব্যসাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অলংকারশাস্ত্রও যে তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। চৌদ্দবৎসর বয়সেই তিনি কবিতার সমালোচনা লিখিয়াছেন এবং তাহাতে খণ্ডকাব্য গীতিকাব্য প্রভৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ষোল বৎসর বয়সে 'ভারতী পত্রিকা'য় মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা বাহির হয়। সমালোচনাটি যে ঐ পত্রিকার তাগাদায় রচিত হইয়াছিল এমন নয়। ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে এই কথাই স্বভাবত মনে হয় যে সংস্কৃত-

কাব্য পাঠ করিয়া তিনি যে অমৃতরসের সন্ধান পাইয়াছিলেন মেঘনাদবধে তাহার একান্ত অভাব তাঁহাকে পীড়া দিয়াছিল। এই প্রবন্ধে সেই কথাই তিনি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কাব্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান কম ছিল না। কিন্তু আঙ্গিক অপেক্ষা তত্ত্বকেই তিনি এই প্রবন্ধে প্রাধান্য দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যকে তিনি অলংকারের সূত্র দিয়া যে বিচার করেন নাই রসবেত্তার দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছিলেন ইহা সহজেই বুঝা যায়। পরবর্তী জীবনে বহুবিধ রচনায় তাহার দৃষ্টান্ত মেলে।

জ্ঞান ভট্টাচার্য মহাশয় প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি শিক্ষাদানের প্রণালী স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ইস্কুলের ধরাবাঁধা পাঠ্যতালিকায় এই বালকের মন ধরা দিবে না তাই তিনি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে সুফল ফলিতেছে ইহা বুঝিতে দেরি হয় নাই, সুতরাং ঐ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী কাব্যও আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের তখন ইংরেজী জ্ঞান যে খুব বেশী ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার জন্য চিন্তামাত্র না করিয়া তিনি শেক্‌সপীয়রের ম্যাকবেথ পড়াইতে শুরু করিয়া দিলেন। শিক্ষক মহাশয় ম্যাকবেথ নাটকটি বাংলায় মানে করিয়া বলিয়া যাইতেন এবং ছাত্রকে দিয়া পদ্যে অনুবাদ করাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া অনুবাদ করিতে করিতে ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই কাব্যানুবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "...খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।"

আমাদের দুর্ভাগ্য সেই কাব্যানুবাদখানি হারাইয়া গিয়াছে। রামসর্বস্ব এই কাব্যখানি শুনাইবার জন্য একদিন রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের কাছে লইয়া যান। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :

> "ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।"

দুঃখের বিষয় উদীয়মান কবিসূর্য মধ্যাহ্নগগনে আরোহণ করিবার পূর্বেই এই অনুকূল সমালোচক পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে গোলদিঘির পশ্চিম পাড়ে তাঁহার মর্মরমূর্তি একটি আছে বটে, কিন্তু হায় মর্মরের তো প্রাণ নাই। প্রাণ থাকিলে সেদিনকার মেঘমেদুর অপরাহ্ণে অস্তরবির ম্লান আলো যখন তাঁহারই সম্মুখ দিয়া অনন্তকালের মত অপসৃত হইয়া গেল তখন ঐ নির্নিমেষ লোচনেও তপ্ত-অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া যাইত।

ম্যাকবেথের তর্জমাটি সম্ভবত সবটিই সেদিন পড়া হইয়াছিল, অন্তত অনেকখানি যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। কারণ কবি জীবনস্মৃতিতে জানাইয়াছেন, রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।"

ইহা হইতে মনে হয় "অদ্ভুত বিশেষত্ব" বালকের তর্জমায় ছিল না। তবে পরে কবি ঐ অংশ কিছু পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন। সমগ্র অনুবাদটি পাওয়া না গেলেও ডাকিনীর উক্তি অংশটি পাওয়া গিয়াছে। ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিলে ভাষা ও ছন্দ "অদ্ভুত বিশেষত্ব"-হীন বলিয়া মনে হয় না। তর্জমার ঐ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

ম্যাকবেথের তর্জমা

ডাকিনীদের উক্তি

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্রবিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনজনে।

২য় ডা— ঝগড়াঝাঁটি থামবে যখন,
হারজিত সব মিটবে রণে।

৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে ত;

১ম ডা— মিলব কোথায় বলে দে ত।

২য় ডা— কাঁটাখোঁচা মাঠের মাঝ।

৩য় ডা— ম্যাকেথ সেথা আসছে আজ।

১ম ডা— কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে!

২য় ডা— ঐ বুঝি ব্যাঙ্‌ ডাকছে মোরে!

৩য় ডা— চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!

সকলে— মোদের কাছে ভালই মন্দ
মন্দ যাহা ভাল যে তাই
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। প্রস্থান।

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা— এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?

২য় ডা— মারতেছিলুম শুয়োরগুলি।

৩য় ডা— তুই ছিলি বোন্‌ কোথায় গিয়ে?

১ম ডা— দেখ্ একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচমচিয়ে
কচমচিয়ে
কচমচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনী মাগী যা তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোরব আমি
কোরব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!

২য় ডা— আমি দেব বাতাস একটি
১ম ডা— তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা— একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা— বাকি সব আমারি আছে।

. . . .

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেলব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে,

মিশবে না কেউ তাহার সাথে
একাশিবার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে হবে সারা।
বল্ দেখি বোন্ এইটে কি?

২য় ডা— কই, কই, কই, দেখি, দেখি।

১ম ডা— একটা মাঝির বুড়ো আঙুল
রয়েছে লো বোন, আমার কাছে
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।

৩য় ডা— ঐ শোন্ শোন্ বাজল ভেরী
আসে ম্যাক্বেথ, নাইকো দেরী।

দৃশ্য। গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিনজন ডাকিনী

১ম ডা— কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।

২য় ডা— তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।

৩য় ডা— হার্পি বলে আকাশ তলে
"সময় হল" "সময় হল!"

১ম ডা— আয়রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে

বিষমাখা ওই নাড়িভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌রে ছুঁড়ি।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে।
হয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেলব মোরা।

সকলে— দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

২য় ডা— জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গির্গিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিকটিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া
শক্ত ওষুধ করতে হবে
টগবগিয়ে ফোটাই তবে।

সকলে— দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

৩য় ডা মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি মরা হাঙ্গর ব্যাং,

ইষের শিকড় তুলেছি রাতে
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণকালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ্।
আনগে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন তাতে।

সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

২য় ডা— বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা করতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "সরোজিনী" নাটকের জন্য রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের কয়েকটি ছত্রের সহিত এই ম্যাকবেথ-অনুবাদের অন্তর্গত চার লাইনের একটি ধুয়ার আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়।

১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়" দ্রষ্টব্য

তুলনা করিয়া দেখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া বক্ষ্যমাণ অংশ দুইটি পাশাপাশি তুলিয়া দেওয়া হইল :

“সরোজিনী”র গান	ম্যাকবেথ-অনুবাদের ধুয়া
জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ দ্বিগুণ	দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।	কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,	দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুণ
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।	ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।

ধ্বনির দিক দিয়া উভয়ের সাদৃশ্য এত নিকট যে স্বভাবতই মনে হয় একটির প্রভাব অন্যটির উপর পড়িয়াছে। সম্ভবত উভয়ের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান অধিক নাই। “সরোজিনী” ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ম্যাকবেথের অনুবাদের ডাকিনী অংশটাও ঐরকম সময়ে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। অন্তত ঐ সময় তিনি কিছু পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন।

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য শুধু ম্যাকবেথ অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা জানি। সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে বালক রবীন্দ্রনাথ কৃত কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের তেতাল্লিশটি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। [১]

তিনি স্বেচ্ছায় ঐ অনুবাদ করিয়াছিলেন অথবা জ্ঞানবাবুর ন্যায় কোনও শিক্ষকের আদেশে করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। তবে জ্ঞানবাবু যে তাঁহাকে কুমারসম্ভব কাব্য আগাগোড়া মুখস্থ করাইয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। যাহাই হউক অনুবাদের ভাষা দেখিয়া উহা যে বাল্যকালের রচিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ১৩৫০

১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ ১৩৫০ দ্রষ্টব্য

সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ অনুবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

কুমারসম্ভব কাব্যের অনুবাদ

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিলা আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক্‌বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিশ্বাস ॥২৫॥

নূপুরশিঞ্জন সহ সুন্দরীকুলের
মোহনপদাঘাতের অপেক্ষা না করি
অশোকতরুর কাঁধ অবধি করিয়া
ফুটিয়া উঠিল ফুল পল্লব সহিতে ॥২৬॥

কচি কচি নবীন পল্লব উদ্‌গমে
সমাপ্তি লভিল যেই নবচূতবাণ
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম ধনুর যেন নামাক্ষরগুলি ॥২৭॥

কর্ণিকার ফুলের এমন বর্ণশোভা
সৌরভ নাহিরে তার বড় প্রাণে বাজে।
একাধারে সবগুণ বর্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাতে বাম ॥২৮॥

ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুমপাত্রে মধু কৈল পান,
শৃঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসার মৃগীর এমনি

দিতেছে গা চুলকিয়া, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিণীটির ॥৩৬॥

শুকতারা সমান অযাত্রা মনে গণি'
নন্দীর নয়নপথ এড়ায়ে মদন
নমেরুতরুর ডাল পালার আড়ালে
হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ ॥৪৩॥

আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারু বেদীতে শার্দূলচর্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে ॥৪৪॥

পূর্বকায় ঋজু স্থির স্কন্ধ দুই নত
কর দুটি শোভিছে উপর মুখা তেলো
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন কোলের গোড়ায় ॥৪৫॥

জড়ানো জটাকলাপে জীয়ন্ত ভুজগ,
দুই ফের করি, আর অক্ষমালা কানে,
গ্রন্থিযুত মৃগছাল আছেন যা পরি'
হইয়াছে নীলবর্ণ কণ্ঠের প্রভায় ॥৪৬॥

বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে, তাকায় মুখপানে
সাধ্য নাই কাহারো. তৃতীয় নেত্র হতে
বাহিরিল সহসা জ্বলন্ত হুতাশন ॥৭১॥

ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর – এই বাণী
দেবতা সবার হোতা চরুক বাতাসে,
হেতায় মদনতনু ভস্ম-অবশেষ ॥৭২॥

বালক রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনার ধরনই ছিল বিচিত্র। তিনি ছেলেবেলায় এমন অনেক বই পড়িয়াছেন যাহার অর্থ বুঝেন নাই। তবু ভালো লাগিয়াছে বলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ছন্দে বাঁধা মন বাহিরে যেখানেই ছন্দের মিল পাইয়াছে সেখানেই একবার করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তিনি বাল্যকালেই সংস্কৃত সাহিত্যে যে রসের সন্ধান পাইয়াছিলেন সংস্কৃত শ্লোকের ছন্দোমাধুর্যের হাতেই তাহার দ্বাররক্ষার ভার ছিল এবং কবির প্রতি এই দ্বারপালের পক্ষপাত ছিল অসামান্য। কুমারসম্ভব কাব্যের

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন তাঁহার মনের ভিতরটা কিরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই বলি :

> "আর কিছু বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রসভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।"

মনে রাখা আবশ্যক যে এই ঘটনা যখন ঘটে তখনও তিনি কুমারসম্ভব পড়া পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আরম্ভ করেন নাই। করিলেও পড়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কারণ এই শ্লোকটির অর্থ নিজে না বুঝিতে পারায় পরে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে বুঝাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে যদি অনুমান করি তখন তাঁহার বয়স বার তের বৎসরের বেশী ছিল না তাহা হইলে বোধ হয় অসংগত হইবে না।

আরও অনেক আগের কথা, তখন সংস্কৃতের জ্ঞান একেবারেই ছিল না বলিলে চলে, সে সময় একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূত আবৃত্তি শুনিয়া বালক

রবীন্দ্রনাথের মন কিরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল তাহা তিনি নিজে লিখিয়াছেন :

"আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায় ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দ শিশুপাঠ্য পুস্তক নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাল্য-কালে উহা বার বার করিয়া পড়িয়াছিলেন। কবি সংস্কৃত তখনও শিখেন নাই তবে বাংলা তিনি খুব ভাল জানিতেন বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতেন এই পর্যন্ত। তিনি বলিয়াছেন :

"জয়দেব যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছু বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।...জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝি নাই অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবুও সৌন্দর্যে মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।"

সতের বৎসর বয়সের কথা বলিতেছি। তখন কুমারসম্ভব শকুন্তলা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া সম্ভবত শেষ হইয়া গিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাইবার প্রাক্‌কালে আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে আসিয়া কিছুকাল থাকিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আমেদাবাদের জজ। তিনি আদালতে চলিয়া গেলে কবি তাঁহার লাইব্রেরি ঘাঁটিয়া মধ্যাহ্নকাল কাটাইয়া দিতেন। এই লাইব্রেরিতে একখানি সংস্কৃত কাব্য-

সংগ্রহ গ্রন্থ ছিল।[১] এই গ্রন্থের কবিতাগুলি তিনি পড়িতে ভালবাসিতেন। সব বুঝিতে পারিতেন না। "কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি" তাঁহাকে "কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।"

সংস্কৃতের মত ইংরেজী সাহিত্যও তিনি আপনমনে পড়িয়া চলিয়া ছিলেন। যখন ইংরেজী অতিসামান্যই শিখিয়াছেন তখন ডিকেনসের ওল্ড কিউরিওসিটি শপ বইখানা আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

> "পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম · "

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গৃহশিক্ষকের পরিবর্তন হয়। জ্ঞান ভট্টাচার্য মহাশয় বিদায় লন তাঁহার স্থলে আসেন ব্রজবাবু। ইনি ছিলেন মেট্রপলিটন কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। ইনি আসিয়াই গোল্ড-স্মিথের ভাইকার অফ ওয়েকফীল্ড হইতে বাংলায় অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। আমরা জীবনস্মৃতি হইতে জানিতে পারি যে ইহা রবীন্দ্রনাথের মন্দ লাগে নাই।

> "তিনি আমাকে প্রথম দিন গোল্ডস্মিথের ভীকর অফ ওয়েকফীল্ড হইতে তর্জমা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না।"

ইহা হইতে অনুমান করা যায় এ বইটাও তাঁহার পড়া হইয়াছিল। কতক হয়তো শিক্ষকের কাছে কতক নিজের ইচ্ছায় শেষ করিয়াছিলেন।

১ ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থ। "জীবনস্মৃতি" দ্রষ্টব্য

সতের বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে অবস্থানকালে টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ নিজের চেষ্টাতেই পড়েন। সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে টেনিসনের যে একখানি কাব্যগ্রন্থ ছিল তাহার অক্ষরগুলি ছিল বড় বড়, তাহা ছাড়া পুস্তকটিতে অনেকগুলি ছবিও ছিল। রবীন্দ্রনাথ সারাদিন ধরিয়া বইখানি উলটাইয়া যাইতেন। "ছবিগুলির মধ্যে বার বার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া" বেড়াইতেন। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতেন না তাহা নহে কিন্তু বালকের কাছে "তাহা বাক্যের অপেক্ষা অনেকটা কূজনের মতোই ছিল।" এখানে অবস্থানকালে আরও অনেক ইংরেজী বই এইভাবে পড়িয়া ফেলেন।

> "সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ একাগ্রমনে নানারূপ ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিতেন।"[১]

এইভাবে পড়িতে পড়িতে বই পড়াটা তাঁহার একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। যে বই পড়িয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেন না সে বইও দিব্য পড়িয়া যাইতেন। অল্প স্বল্প যাহা বুঝিতেন তাহারই আনন্দে পড়ার উৎসাহ পাইতেন। ইংরেজী বইয়ের মানে বোঝা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ছিল কিন্তু সে কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। যেমন করিয়া হউক অভিধান দেখিয়া পড়িয়া যাইতেন।

কতক বুঝিয়া কতক না বুঝিয়া পড়া তাঁহার জীবনে নিরর্থক হয় নাই। এইরূপ পাঠ হইতে তিনি কি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

> "একটা শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয়, আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে

১ "বঙ্গভাষার লেখক", পৃঃ ৯৮৫

আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না।…কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়।"[১]

এই কথাই তিনি বারংবার বলিতে চাহিয়াছেন যে, ছেলেদের জন্য শিশুপাঠ্য বলিয়া কয়েকটি মাত্র বই সুনির্দিষ্ট করিয়া রাখা অনাবশ্যক। বালকের কাছে বয়স্কপাঠ্য বই ধরিলে কোনও ক্ষতি নাই। অর্থ সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট না বুঝিলেও যতটুকু বুঝিবে তাহার মূল্যও কম নয়।

"মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে,
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে,
কিছু বুঝি কিছু নাই বা বুঝি
কিছু না হ'ক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।"[২]

প্রথম বয়সের এই অভিজ্ঞতাকে কবি পরিণত বয়সে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের বিদ্যালয়ে ছেলেদের পড়াইতেন তখন "বড়ো বয়সের পাঠ্য সাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে" ধরিয়াছেন।

১ "বিশ্বপরিচয়"

২ যাত্রাপথ, "আকাশপ্রদীপ"

বিলাতযাত্রার উদ্‌যোগ

বিলাতী চালচলন মোটামুটি অভ্যাস করাইয়া লইবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বীয় কর্মস্থল আমেদাবাদে লইয়া আসিলেন। সেখানে নির্জন বাড়িতে সারা দুপুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন আর সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরি হইতে ইচ্ছামত নানা বই লইয়া পড়িতেন।—পূর্বেই একথা বলা হইয়াছে। এইভাবে কাটাইবার ফলে পড়াশোনা কিছু হইল বটে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আসা সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনো সুবিধা হইল না। মেজ বউঠাকুরানী এবং তাঁহার ছেলেমেয়েরা ইংলণ্ডে থাকায় বিলাতী চালচলন শিক্ষার তেমন সুযোগ ঘটিল না। আর খালি বাড়িতে একলা থাকাও তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে তিনি কখনও বাড়ি ছাড়া হইয়া এভাবে একলা কাটান নাই। উপনয়নের পর হিমালয় ভ্রমণকালে পিতার সান্নিধ্য সর্বদাই পাইতেন। কিন্তু এখানে দাদার সাহচর্য খুব সুলভ ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ বুঝিলেন মা দিদি বউঠাকুরানীদের কাছছাড়া হইয়া নিঃসঙ্গ কাটাইতে তাঁহার নিশ্চয় খুব কষ্টবোধ হইতেছে। তাই তিনি কিছুদিনের জন্য ভ্রাতাকে বোম্বাইয়ের একটি মারাঠী গৃহস্থবাড়িতে পাঠাইলেন। গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের মধ্যে বাস করিলে বাড়ি ছাড়ার দুঃখটা তত প্রবল হইবে না বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা করিবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন অবাঙালীর বাড়িতে বাস করিলে সর্বদা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে ইংরেজীতে কথোপকথন সহজে আয়ত্ত হইয়া যাইবে। অবশ্য যে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাসা লইলেন সেখানে শুধু ইংরেজী ভাষার নয় ইংরেজীয়ানার চর্চাও প্রবল ছিল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রচলন ছিল। একটি

মেয়ে তো বিলাতে গিয়া সেখান হইতেই শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে ঐ পরিবারের চালচলন অতিশয় প্রগতিপ্রবণ এবং সংস্কারবিমুক্ত ছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা বিলাত-প্রত্যাগত যে মেয়েটির কথা বলা হইল তাঁহার নাম ছিল অন্নপূর্ণা তরখড়কর [১] সংক্ষেপে আনা তরখড়। বোম্বাই প্রদেশের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন 'তরখড়কর' একটি কুলপদবী। মারাঠীদের মধ্যে এ পদবীর বহুল প্রচলন আছে।[২]

এই মারাঠী ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। ইঁহার সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবাসদুঃখের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। ইঁহার সহিত বাক্যালাপে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী শিক্ষা অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং অন্নপূর্ণাও তাঁহার কাছে বাংলা শিখিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত বাংলা কবিতা তাঁহাকে ইংরেজী তর্জমা করিয়া শুনাইতেন। শুনিয়া অন্নপূর্ণা খুব খুশী হইতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে

১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রবীন্দ্রগ্রন্থ-পরিচয়ে" ইঁহারই নাম 'অ্যানা টারখুদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের লিখিত রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী প্রবন্ধে ('শনিবারের চিঠি', পৌষ ১৩৪৬) বলা হইয়াছে "Turkhud-উপাধিধারী একজন আইরিশ ম্যানের সহিত বিবাহ হওয়াতে ইঁহার Ana Turkhud নাম হইয়াছিল।" বস্তুত উপাধিটি আদৌ আইরিশ নহে। দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের তিনি আত্মীয়া ছিলেন। এবং দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের কৌলিক পদবী ছিল তরখড়কর, সংক্ষেপে তরখড়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে জানিলাম কবি একবার এই মহিলার কথা তাঁহার নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ওই নামও বলিয়াছিলেন। আমার মারাঠী বন্ধু শঙ্করকৃষ্ণ লাঘাটে এম্. এ. মহাশয়ের নিকট হইতেও প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য জানিতে পারিয়াছি।

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "আমার বোম্বাই প্রবাস", পৃঃ ১০৪ দ্রষ্টব্য

একটি বাংলা নাম দিয়াছিলেন এবং সেই নামে গান রচনা করিয়াও শুনাইয়াছিলেন। এইভাবে ইংরেজী কথোপকথন অভ্যাসের সহিত কাব্যচর্চাও চলিতে লাগিল। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহিলাটির মৃত্যু হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে ইঁহার স্মৃতি কোনওদিন মলিন হইতে পায় নাই।

ইঁহার কথা স্মরণ করিয়া কবি ছেলেবেলায় বলিয়াছেন :

> "আমাদের ওই বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয় বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"

জীবনের বটগাছে যে বিদেশী পাখী দুদিনের জন্য বাসা বাঁধিয়াছিল বহুদিন হইল সে বাসা ছাড়িয়াছে কিন্তু দূর হইতে আহরণ করিয়া আনা অজানা গানের যে সুর শুনাইয়া গেল কবির মনের তারে তাহার অনুরণন আর থামিল না।

বিলাতের শিক্ষা

বিলাত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের যে শিক্ষা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। ইস্কুলের বন্দী জীবন তাঁহার ভাল না লাগিলেও গৃহ-শিক্ষার যে আয়োজন ছিল তাহা এতই সুপ্রচুর যে ফেলাছড়া করিয়াও যাহা রহিয়া গেল সতের বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে তাহা যথেষ্ট বলিতে হইবে।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর সত্যেন্দ্রনাথের সহিত "এস এস পুনা" নামক জাহাজে তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।[১] অভিভাবকদের ইচ্ছা ছিল বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিবেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত যান তখন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী ছেলেদের লইয়া ব্রাইটনে বাস করিতেন। বিদেশে পৌছানর পর প্রথম কয়েকটা দিন ইঁহারই আশ্রয়ে কাটে।

তাহার পর ব্রাইটনের একটি পাব্লিক স্কুলে তিনি ভরতি হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ প্রথমেই তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিয়াছিলেন: "বাহবা তোমার মাথাটা তো চমৎকার।" বলা বাহুল্য অধ্যক্ষ মহাশয় তখন শুদ্ধমাত্র মাথার বাহ্য গঠনটার কথাই বলিয়াছিলেন।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট হইতে তিনি যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন স্বদেশে তাহার কল্পনাও অসম্ভব ছিল। তাহারা বিদেশী সহপাঠীর সহিত রূঢ় ব্যবহার তো করেই নাই বরং অপ্রত্যাশিতরূপে সহৃদয় আচরণ করিয়াছে। তাহারা রবীন্দ্রনাথের পকেটের মধ্যে অনেক সময়ে কমলালেবু আপেল প্রভৃতি গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

ছাত্র ও শিক্ষকের কাছে সদয় ব্যবহার পাইলেও এ ইস্কুলেও বেশী দিন

[১] **The V.-B. Quarterly, Tagore Birthday Number**

পড়া হইল না। তখন তারক পালিত মহাশয় ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিয়া কবিকে লণ্ডনে আনাইলেন। সেখানে তাঁহাকে একলা একটা বাসায় রাখা হইল। একজন শিক্ষক এই বাসায় আসিয়া তাঁহাকে ল্যাটিন পড়াইয়া যাইতেন। এই শিক্ষকের পরিবারের লোকেরা তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত লোক বলিয়া জানিত। একটা মতে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল যে পৃথিবীতে এক একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানবসমাজে একই রকম ভাবের আবির্ভাব হয়। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সর্বদাই তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং লিখিয়া চলিয়া ছিলেন। এদিকে অন্নবস্ত্রের অভাবে সংসারের আর সকলে তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। ইঁহার কাছে পড়াশুনা বেশী কিছু হয় নাই।

ইহার পর বার্কার নামক একজন শিক্ষকের গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। ইনি বাড়িতে পড়াইয়া ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইঁহার বাড়ির বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন:

> "ইঁহার ঘরে ভালোমানুষ স্ত্রীটি ছাড়া অত্যল্পমাত্রও রম্য জিনিস কিছুই ছিল না।"

এই স্ত্রীর সহিতও বার্কার সাহেব ভালো ব্যবহার করিতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মন যে সে বাড়িতে বসিতে পারে না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহাই হউক এখানেও দীর্ঘকাল থাকিতে হইল না। কারণ এই সময় বউঠাকুরানী ডেভনশিয়রে টর্কি নগরে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে দেবরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সমুদ্র-তীরবর্তী এই স্থানটি বালককবির মনকে তখন বিশেষভাবে দোলা দিয়াছিল। এইখানে নীলসাগরের শৈলবেলায় বসিয়া তিনি 'ভগ্নতরী' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিলাতে থাকিতে গদ্যপদ্য যাহা কিছু লিখিত হয় সে সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইয়াছে।

ডেভনশিয়র হইতে কবি আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং ডাক্তার স্কট নামক এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। স্কট পরিবারে তিনি যে স্নেহসমাদর ও আন্তরিকতা পাইয়াছিলেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময় হেনরি মর্লি ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক। ইঁহার শিক্ষাদানের প্রণালী কবির বিশেষ ভাল লাগিত। অধ্যাপক মর্লির কাছে কবি যে সকল পুস্তক পড়িয়াছিলেন তাহার মধ্যে শেক্‌সপীয়রের "Coriolanus" এবং স্যর টমাস ব্রাউনের "Urn Burial"এর নাম পাওয়া যায়।

বিলাতে য়ুনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে লোকেন পালিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স সতের এবং বন্ধুর বয়স তেরো। এই সময় লাইব্রেরি ঘরে অধ্যয়ন অপেক্ষা গল্পটাই জমা স্বাভাবিক। বস্তুত হইতও তাহাই। কিন্তু এই হাস্যালাপের মধ্যে দুই বন্ধুতে সাহিত্য আলোচনাও চলিত। সাহিত্যের সহিত ভাষাতত্ত্বের আলোচনাও চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন তাহা শব্দতত্ত্বের পাঠকগণ বিশেষরূপে জানেন। এই গবেষণার সূত্রপাত হয় এইখানে থাকিবার সময়। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখিতে আরম্ভ করেন। পূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে বাংলা বানান একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে, ইংরেজী বানানের মত সে স্বেচ্ছাচারী নয়। কিন্তু একটি বিদেশী মেয়েকে পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল।[১] তিনি দেখিলেন, বাংলা বানানের

১ "ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস (বাংলা উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই এই বিশ্বাস) সম্পূর্ণ সমূলক নয়।" "শব্দতত্ত্ব"

যেমন নিয়ম আছে তেমনি ব্যতিক্রমও যথেষ্ট আছে। তখন তিনি এই ব্যতিক্রমের মধ্যেও নিয়ম লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতেন, এই কাজে বন্ধু লোকেন পালিত মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। উত্তর-কালে যাঁহার প্রবল আনন্দ রবীন্দ্রনাথের "রচনার বেগকে পালের মতো অগ্রসর করিয়াছে" সেই বন্ধুর সহযোগিতা এই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কর্মে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে কত বিষয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং কত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকাধারে রক্ষিত থাকিত শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন।[১] তাঁহার জিজ্ঞাসার পরিধি বাল্যকাল হইতেই ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি যে কিরকম পড়ুয়া ছিলেন তাহা লণ্ডনে অবস্থানকালীন একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ হইতে জানা যায়। শহরতলীর এক অখ্যাত রেলস্টেশনে একদিন তাঁহার রাত্রিযাপনের সম্ভাবনা ঘটে। খবর লইয়া জানিতে পারেন রাত্রে কোনও গাড়ি নাই, কাছাকাছি সরাইও ছিল না, শীতও ছিল ভয়ংকর। এই অবস্থায় তিনি স্পেনসরের সদ্যপ্রকাশিত Data of Ethics গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন।

যাহাই হউক বিলাত হইতে ব্যারিস্টার না হইয়াই কবি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

১ 'Rabindranath Tagore', The V.-B. Quarterly, Tagore Birthday Number, 1941

কবিত্বের উদ্বোধন

কবিতা রচনার কথা আরম্ভ করিতে হইলে একেবারে গোড়ার কথা কিছু বলিতে হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ দিয়া বিদ্যারম্ভ হইয়াছে। অক্ষর চেনার পর 'কর খল' শেষ হইয়াছে। তাহার পর আরম্ভ হইয়াছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। কবির মনোবীণার তারগুলি বিধাতা যেন সুরে বাঁধিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন—বাহিরের কোথাও এতটুকু সুরের কম্পন উঠিলেও সে তার ঝংকৃত হইয়া উঠিত। এই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ইহার মধ্যে যে একটি ছন্দ আছে মিল আছে তাহা বালকের অস্ফুট কবিত্বের তারে অনুরণিত হইয়া আবর্তিত হইতে লাগিল। কেন যে হইল তাহা বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই।[১]

চারিটি মাত্র কথা। জল পড়ে। পাতা নড়ে। কথা অতি সামান্যই তবু ইহার মধ্যে কথার অতীত আরও যেন কি অব্যক্ত রহিয়াছে। যাহা বলিবার তাহা ছাড়াও অনির্বচনীয় আর কিছু যেন প্রকাশ করিতেছে। বক্তব্যটুকু বলিয়াই তাহার গতি বন্ধ হইল না। সাধারণ বাক্যে যাহা এই অব্যাহত গতির সৃষ্টি করে তাহাই ছন্দ। কথার সঙ্গে ছন্দ মিলিত হইলেই হৃদয়ভাবের সঙ্গে তাহার যোগসাধন হয়। কিন্তু সকলের হৃদয়-ভাব তো সমান নয়—তাই ছন্দ মাত্রই সকলের প্রাণে সমান আবেগের সৃষ্টি করে না। রবীন্দ্রনাথের মন শিশুকাল হইতেই ছন্দ সম্পর্কে স্পর্শ-কাতর। ছন্দের দোলায় তাঁহার স্পন্দনোন্মুখ মন স্বতই আন্দোলিত

১ বিদ্যারম্ভের সময় তাঁহার বয়স চার পাঁচ বৎসর মাত্র হইবে। "চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তিনি নিজেই পড়িতে পারিতেন।" "বঙ্গভাষার লেখক"

হইয়া উঠে। শুধু কথার ছন্দই নয়—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিবিধ ধ্বনির বিচিত্র কম্পনে তাঁহার মনকে অনুকম্পিত করিয়া তোলে।

"জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে-বাঁধা মন নিয়া,
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।"[১]

এইভাবে বিচার করিলেই বুঝিতে পারি শিশুর প্রাণের তারে "জল পড়ে পাতা নড়ে" কি সুর তুলিয়াছিল। বুঝিতে পারি কেন তিনি বলিয়াছিলেন: "আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" বস্তুত মিল কবিতার একটা প্রধান অঙ্গ। ছন্দ ও মিল লইয়াই কবিতা।

"মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না। তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও তাহার ঝংকারটা ফুরায় না· মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে।"

ছন্দ ও মিলের রহস্যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম কবিতা তাঁহার অন্তরলোকে যে অনির্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা তিনি জীবনে বিস্মৃত হন নাই। কাব্য-পাঠের সেই প্রথম দিবসের কথা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

"এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বিয়োগবেদনার অশ্রুসমুদ্র মন্থন করিয়া তবেই আদি কবি বাল্মীকি কবিতালক্ষ্মীর সাক্ষাৎ লাভ করেন, আমাদের বিশ্বকবির কবিত্ব উদ্বোধনের প্রাক্‌কালে বিয়োগের সকরুণতা অপেক্ষা মিলনের সুমধুর চিত্রটাই স্ফুটতর

[১] ধ্বনি, "আকাশপ্রদীপ"

হইয়া দেখা দিয়াছিল। সেই মিলনমহোৎসবের নায়ক ছিলেন কবি স্বয়ং, নায়িকা তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। কিন্তু কৈলাস মুখুজ্যের ছড়ায় "একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।" কৈলাস মুখুজ্যের ছড়ার দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলায় তাঁহার মন মাতিয়া উঠিত। সেকালের সেই মনমাতান স্মৃতির আভাস একালের কবিতায় রূপ পাইয়াছে :

"ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে :
ভাবখানা মনে আছে,—'বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আম কাঁঠালের ছায়ে
গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।'
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র—আগমনী গানে
ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
... ...
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।"[১]

[১] বধূ, "আকাশপ্রদীপ"

ছেলেভুলানো ছড়া এবং ঘুমপাড়ানি গানের মধ্য দিয়াও বালকের মন কাব্যামৃতরসাস্বাদ লাভ করিত।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ি যান॥"

এই ছড়াটি তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এটি তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে বেশী বয়সেও ইহার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রকাব্যের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন বর্ষাঋতুর সহিত তাঁহার মনের কিরূপ একটা গভীর যোগ ছিল। বর্ষার সঙ্গে এই যে অন্তরের মিল কবির বাল্যকাল হইতেই তাহা লক্ষ্য করা যায়।

"বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন ;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।"[১]

বর্ষার দিনে কখনও অকারণ আনন্দে তাঁহার মন পুলকিত হইয়া উঠিত। কখনও বা অব্যক্ত বিষাদে মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়িত। এমন কতদিন হইয়াছে জোরে বাতাস বহিতেছে তাহার বেগে জলের ছাট আসিয়া বারান্দায় পড়িতেছে, আর বালক কবি সেই বারান্দায় ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। জলের ছাটে গা ভিজিয়া যাইতেছে সে দিকে লক্ষ্যও নাই। কতদিন ইস্কুলে গিয়াছেন, দরমায় ঘেরা দালানে ক্লাস হইতেছে। বিকাল বেলা, ছুটির ঘণ্টা তখনও বাজে নাই, এমন সময় দেখিতে দেখিতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল, গুরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। বাতাসে দরমার বেড়া

১ বালক, "পুনশ্চ"

ভাঙিয়া পড়িতে চায়। অন্ধকারে বইয়ের পাতার কালো অক্ষর আরও কালো হইয়া আসে। পণ্ডিত মহাশয় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রেরা হুটাপুটি করিতেছে। বালক রবীন্দ্রনাথ নিজের আসনে চুপটি করিয়া বসিয়া আছেন কিন্তু তাঁহার মন তখন তেপান্তরের মাঠে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

বর্ষার গভীর রাত্রে কতদিন তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। বাহিরে ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির একটানা বৃষ্টিধারার শব্দে হৃদয়ে কেমন যেন একটা আনন্দের শিহরণ জাগিতেছে। মনে মনে প্রার্থনা করিতেছেন,—এই বৃষ্টি যেন না থামে। কাল সকালে উঠিয়াও যেন দেখি এমনি ধারা ঝম ঝম করিয়া জল পড়িতেছে। যেন বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই, বাড়ির সামনের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে, আর সেই বটতলার পুকুরঘাটের সব কটি ধাপ জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

তাঁহার শৈশবের চিত্তপটে বর্ষাদিনের বায়ু ও বর্ষণ, বজ্র ও বিদ্যুৎ, আকাশ ও পৃথিবী যে অস্ফুট ছবি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহার প্রতিচ্ছবি যে কত রচনার মধ্যেই স্ফুটতররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রুদ্ধদ্বার গৃহকোণে বসিয়া বাতায়নের মধ্য দিয়া আকাশের সবটুকু দেখা যাইত না। যেটুকু দেখা যাইত প্রতিদিনের দেখায় সেটুকু পুরানো হইয়া গিয়াছিল। ঘরের ছেলেটির মতো সেও ছিল ধীর স্থির।

"বাদলের দিনে গুরু গুরু করে তার বুক উঠত দুলে
বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওআলা কালো সিংহের মতো।
নারকেল ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে

যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে বনে বনে।”

দেখিতে দেখিতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামে। পুকুরের পঁইঠা জলে ডুবিয়া যায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙিতেই দক্ষিণের জানালায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিতে পান

“পুকুর গেছে ভেসে
জল বেরিয়ে চলেছে কল কল করে বাগানের উপর দিয়ে।”

মনে হয় পুকুরের বন্দীদশা কাটিয়া গিয়াছে।

“কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা
এ বেলা ও বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে, যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো,
পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছলছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়া পরা বাউল যেন।”[১]

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—এটিও বর্ষার ছড়া। বালকের কল্পনাপ্রবণ বর্ষাবিলাসী মনে এই ছড়ার কথাগুলি ছন্দ ও সুর সহযোগে একটি অপরূপ সুখচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত। শিশুকালের সেই চিত্র প্রবীণ বয়সে কথার তুলিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই ছড়াটি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

“তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তাল

১ বালক, “পুনশ্চ”

তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবু ঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত।"

রবীন্দ্রনাথের সহজাত কবিপ্রতিভার প্রথম স্ফুরণের ইতিহাসে এই ছড়াগুলির মূল্য কম নয়। ইহারা শুধু কল্পনার চিত্রপটে ছবি আঁকিয়াই তো ছুটি লইত না, এই ছড়ার সুর তাঁহার কানে বাজিলেই প্রাণের তারে ঝংকার তুলিত—এবং সে ঝংকার কখনও মিলাইয়া যাইত না। ছড়ার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক কাব্যরস আছে তাহা তিনি শৈশবেই আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। স্বভাবের মধ্যে কবিত্ব ছিল বলিয়াই তাহা অনুভব করা সম্ভব হইয়াছিল।

এই সকল ছড়া বালকের মনে মোহমন্ত্রের কাজ করিত। সেই মুগ্ধ অবস্থা পরিণত বয়সেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি ছেলেবেলার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব।......আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"[১]

১ "লোকসাহিত্য"

এ ছাড়া কবিতার বই তিনি যে বাল্যবয়সেই অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে চাণক্য শ্লোকের বাংলা অনুবাদ, রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, কুমারসম্ভব, গীতগোবিন্দ, ম্যাকবেথ নাটক, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল প্রমুখ কবিদের কবিতা—এ সব পড়া হইয়াছিল। উল্লিখিত পুস্তকাদির অধিকাংশই তিনি স্বেচ্ছায় পড়িয়াছিলেন, অভিভাবক বা শিক্ষকের তাড়ায় নয়। কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল স্বাভাবিক।

গৃহের পরিবেশও কবিত্ববিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল। নাট্য কৌতুক আমোদ উৎসবের সহিত জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কাব্যরচনারও বিরাম ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। এদিকে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দের প্রস্রবণ। চিত্রে গানে কবিতায় তাঁহার সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল। বিচিত্র ছন্দে বিবিধ ভাবের অজস্র কবিতা তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে কবি বড়দের সহিত মেলামেশার সুবিধা পান নাই। তাঁহাদের কাব্যভোজে পাতা পাড়িয়া এক পংক্তিতে বসিবার অধিকার তাঁহার ছিল না, তথাপি ঘ্রাণে অর্ধভোজনের ব্যাঘাত হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন "স্বপ্নপ্রয়াণ"[১] লিখিতেছেন তখনও রবীন্দ্রনাথ বালক। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছেন আর গুণেন্দ্রনাথকে শুনাইতেছেন, আর ঘন ঘন উচ্চহাস্যের রোল উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

> "তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার

১ "স্বপ্নপ্রয়াণে"র প্রথম সর্গ ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কিনা জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।"

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ চারিছত্রে যে দেবনিকেতন অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিই :

> "ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
> গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
> নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি
> সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ শৈশবে শিশুকবির চিত্তকে তরঙ্গভঙ্গে নাড়া দিয়াছিল কিন্তু কৈশোরবয়সে তাহাই আবার রত্নরাশি লইয়া ধরা দেয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কিশোর দেবরের সাহিত্যচর্চার সঙ্গী ছিলেন সে কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। "এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই" ছিলেন বলিয়া ইহার সৌন্দর্য সহজেই কবির হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। সেই কারণে এই দুই সাহিত্যরসিক দেবর-ভ্রাতৃজায়া স্বপ্নপ্রয়াণ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইতেন।

বউঠাকুরানীর সাহিত্যচর্চার আর একটি উপকরণ ছিল বিহারীলালের সারদামঙ্গল। রবীন্দ্রনাথও এ কাব্যের পরম ভক্ত ছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় বিহারীলালের কবিতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

রচনারম্ভ

বালক কবির কল্পলোকে কবিতার ক্ষেত্রটি দিব্য ফসল ফলাইবার উপযোগী হইয়া উঠিতে থাকিল। রৌদ্রজলের অভাব ছিল না, বীজেরও ছড়াছড়ি। শুধু বপনের কৌশলটুকু জানাই বাকি।

এমন সময় একদিন গুরু জুটিয়া গেলেন কবির এক ভাগিনেয়—নাম জ্যোতিঃপ্রকাশ। সম্বন্ধে শিষ্যের চেয়ে ছোট হইলে কি হইবে বয়সে কিছু বড়ই ছিলেন। কাজেই বয়োমর্যাদার জোরে পদমর্যাদার অভাব হইল না। এই গুরুমশায় একদিন দুপুরবেলা বালকমামাকে "তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষরে যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি বুঝাইয়া দিলেন।" কবির বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না।

পদ্য যাহারা লেখে তাহারা না জানি কি অসাধারণ মানুষ—এই ছিল বালকের ধারণা; কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ যখন পদ্য লিখিবার কৌশল শিখাইয়া দিলেন তখন ভয় ভাঙিয়া গেল। যখন দেখিলেন চৌদ্দটি মাত্র অক্ষর একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বসাইতে পারিলেই রামায়ণ মহাভারতের মত কবিতা হইয়া দাঁড়ায় তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।[১] মনের আনন্দ শুধু যে মনেই চাপা রহিল তাহা নয়, বর্ষার জল পাইলে ভুঁইচাঁপা ফুল যেমন হঠাৎ মাটি ফুঁড়িয়া দলে দলে বাহির হইয়া আসে, গুরুর মন্ত্রে

১ "কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দমেলানো মিলকরা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকেই লিখে থাকে।......পয়ার ত্রিপদীমহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর ছয় অক্ষর দশ অক্ষরের চোকো চোকো কত রকম শব্দ ভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙাগড়ার খেলা।" 'প্রতিভাষণ'

শিশু কবির মনের কথাগুলি তেমনি বিচিত্র ছন্দের কবিতা আকারে বাহির হইয়া খাতার পাতায় পাতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিশুর অস্ফুট কাকলীর মত নবীন কবির সেই নবীনতম কবিতাগুলি পড়িবার লোভ হয়, কিন্তু সে লোভ আর মিটিবে না।

নীল রঙের ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজের একখানি খাতায় কবির প্রথম কবিতাগুলি লিখিত হয়। খাতাটি কোনও এক কর্মচারীর কাছে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হয়তো মহানন্দই তাঁহাকে এই খাতাটি জোগাইয়া থাকিবেন। তখনকার দিনে আজিকার মত এমন রুলটানা একসার্সাইজ বুক পাওয়া যাইত না। কাজেই তাঁহাকে পেন্সিলের সাহায্যে নিজের হাতেই লাইন টানিয়া লইতে হইয়াছিল। লাইনগুলা তেমন সমান হয় নাই, আর অক্ষরগুলাও তখন খুব পাকা ছিল না। সেই নীল কাগজের খাতা, সেই আঁকা বাঁকা লাইন, সেই কাঁচা হাতের অক্ষর আর সেই শিশু মনের কবিতা সবই এমনভাবে হারাইয়া গিয়াছে যে আর কেহ কোনও দিন তাহা খুঁজিয়া পাইবে না। এই নীল কাগজের খাতাখানি বালক কবির সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিত। তাহার অবশ্য একটা কারণ ছিল।

কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা পড়িয়া শুনাইবার ইচ্ছাটা কবি মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। হঠাৎ শ্রোতা জুটিয়া গেলে তখন যদি খাতা হাতের কাছে না থাকে তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা; কারণ, খাতা আনিতে আনিতে শ্রোতা অদৃশ্য হইতে পারেন।

তবে একটা সুবিধা এই ছিল যে দাদার কৃপায় শ্রোতার অভাব হইতে পাইত না। বাড়িতে কেহ আসিলেই তিনি ডাকিয়া ডাকিয়া কনিষ্ঠ সহোদরেরর কবিতা শুনাইতেন। এই সময়কার কথা কবি জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন:

"হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত আমার দাদা [১] আমার এই রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।"

নর্মাল স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন তাঁহার নাম সাতকড়ি দত্ত।[২] ইঁহার নাম জীবনস্মৃতিতেও পাওয়া যায়। ইঁহার ব্যবহার হরনাথ পণ্ডিতের মত ছিল না। ইঁহার কাছে শিশুকবি কবিতা রচনায় কিছু উৎসাহ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীতে ইনি পড়াইতেন না। তবু কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে পারেন। সংবাদটা সত্য কিনা তাহা একদিন তিনি কবিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে জানা যায় সাতকড়ি দত্ত যাহা শুনিয়াছেন তাহা অমূলক নয়।

ইহার পর হইতে তিনি উৎসাহ দিবার জন্য কবিতার দুই এক চরণ নিজে রচনা করিয়া দিতেন এবং বাকি অংশটা ছাত্রকে পূরণ করিতে বলিতেন। একবার তিনি একটি শ্লোকের এই দুইটি চরণ দিয়া কবিকে পাদপূরণ করিতে বলেন :

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

১ বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ

২ "রবীন্দ্রনাথ যখন নর্মাল স্কুলে শিক্ষালাভার্থ প্রবিষ্ট হন তখন এই স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন।"
'বঙ্গভাষার লেখক', পৃঃ ৯৮৫

রবীন্দ্রনাথ আর কয়েকটি ছত্রে শ্লোকটি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে। আমার সেকালের কবিতাকে কোনো মতেই যে দুর্বোধ বলা চলে না তাহারই প্রমাণ স্বরূপে লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম।

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

বহুকাল পূর্বে অধুনা-বিলুপ্ত 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জীবনী প্রসঙ্গে 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' এই ছত্রের একটি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহাতে 'হীন' এই শব্দটির স্থানে 'দীন' এই পাঠ ছিল।[১]

নর্মাল স্কুলের আবেষ্টনী কবিত্ববিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না, তবু শিক্ষকের উৎসাহ এবং বালক বয়সে কবিখ্যাতির প্রলোভন—এই দুয়ে মিলিয়া তাঁহার কাব্যানুশীলনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নাম ছিল গোবিন্দবাবু। ইহারই সম্মুখে রবীন্দ্রনাথকে একবার পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। সেই হইতে গোবিন্দবাবু বালক রবীন্দ্রনাথকে খুব ভাল বাসিতেন। তাহার পর যখন শুনিলেন তিনি এত অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে পারেন তখন গোবিন্দবাবু অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

একদিন ছুটির সময় সংবাদ আসিল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িয়াছে। সংবাদ শুনিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল। গোবিন্দবাবু

১ 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৪৮

ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। তাঁহাকে সকলে ভয় করিত। বালক রবীন্দ্রনাথ ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি না কি কবিতা লেখ ?

কবিত্বের কথা কবি অস্বীকার করিলেন না।

তখন গোবিন্দবাবু তাঁহাকে সুনীতি সম্বন্ধে একটি কবিতা বাড়ি হইতে লিখিয়া আনিতে বলিলেন। ফাঁসির আসামীকে যদি মুক্তি আর সেই সঙ্গে কিছু পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা হইলে যেমন বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া যায় রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। গোবিন্দবাবুর আহ্বানের একটি মাত্র অর্থ—বেত্রদণ্ড। এহেন লোকের কাছে কবিতা রচনার আদেশ—আশ্চর্য হইবারই কথা।

পরদিন যথাসময়ে সুনীতিবিষয়ক এক কবিতা লিখিয়া ছাত্রকবি গোবিন্দবাবুর কাছে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দবাবু সে কবিতা পড়িয়া এমনই খুশী হইলেন যে তিনি কবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া কবিতাটি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কবি উৎসাহের সঙ্গেই শিক্ষকের আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

কবিতা শুনিয়া গোবিন্দবাবু প্রসন্ন হইয়াছিলেন বটে কিন্তু ছাত্রদের মুখে সেরূপ ভাব দৃষ্টিগোচর হইল না। উহা যে রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা এ কথাই অনেকে বিশ্বাস করিল না। একজন স্পষ্টই বলিয়া বসিল—এ কবিতা ছাপার বইয়ে পড়িয়াছি। আমি সে বই আনিয়া দেখাইতে পারি। কথাটা মিথ্যা তবু সেই মিথ্যাই অধিকাংশ ছাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল।

ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে কাব্যরচনার দীক্ষা গ্রহণের অনেক পূর্ব হইতেই মনে মনে কবিতা রচনা শুরু হইয়া গিয়াছিল তাহার দুই একটি প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। দিদিমা ঠাকুরমার মুখে শোনা গান ও

ছড়ার ভাঙা ভাঙা টুকরা দিয়া সেই সকল কবিতার মূর্তি রচিত হইয়াছিল। এমনিধারা একটি কবিতা এখানে তুলিয়া দিতেছি :

"সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস
পটপট পটাস।"

এই কবিতার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। এখানে তাহার উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বাল্যকালে শিশুকবির একটা মজার খেলা ছিল—'পূজা পূজা' খেলা। তাঁহার খেলনা ছিল একটি কাঠের সিংহ। দুর্গাপূজায় কালীপূজায় ঠাকুরের সম্মুখে ছাগল বলি দেওয়া হয় তাহা তিনি জানিতেন। খেলার পূজারী ভাবিলেন খেলার পূজাতেও বলি দেওয়া আবশ্যক। লোকে পশু বলি দেয়, তিনি দিতেন পশুরাজ। সে জন্য বন বনান্তর ঘুরিতে হয় নাই তাহা বড়িতেই ছিল। অভাব ছিল শুধু খড়্গের—একটা লাঠির দ্বারা সে কাজটাও একরকম চলিয়া যাইত। খড়্গের অপেক্ষা লাঠিটাই বরং ভাল ছিল। কারণ খড়্গের কোপ লাগিলে সিঙ্গিমামা একেবারেই দুখণ্ড হইয়া যাইতেন। লাঠির কোপে সে ভয়টা ছিল না—তাই বলিদান ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তিতে কোনও অসুবিধা হইত না।

এই পশুরাজ বলিদানের জন্য মন্ত্র চাই তো! পূজারী নিজেই সে ভার লইলেন। উপরের ছড়াটি সেই বলিদানের মন্ত্র।

বাল্যকালের রচিত আর একটি কবিতার কিয়দংশ এইরূপ :

"আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—

হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

কবি নিজে এই কবিতাটিকে বাল্যবয়সের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিলেও যে বয়সে "সিঙ্গিমামা কাটুম" অথবা "মীনগণ হীন হয়ে"-জাতীয় কবিতা লেখা হয় ইহা স্পষ্টতই সে বয়সের নয়। যতদূর মনে হয় ইহা আরও কিছু বেশী বয়সে রচিত। 'নিস্তব্ধ' শব্দে 'স্ত' এই যুক্তাক্ষরের দ্বিমাত্রিকতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। "পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে" – এই ছত্রেও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সবিশেষ পরিচয় আছে।

যাহাই হউক শিশুকবির কাঁচা হাত ক্রমশ পরিপক্ব হইতে লাগিল। শ্রোতার সংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল। কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নীল খাতায় আর স্থান সংকুলান হইল না, তাহা ছাড়া নিত্যব্যবহারের ফলে খাতাটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং সেটিকে বিদায় দিতে হইল। ইহার কিছুকাল পরে কবি একটি বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসে এই খাতাটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

বয়স এগার কি বার। হাফ টিকিটের ঘটনা হইতে বোঝা যায় বার তখনও পূর্ণ হয় নাই।

> "এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে।"

কবি উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে বোলপুরে আসিয়াছেন, সঙ্গে আছে, 'লেট্‌স্‌ ডায়ারি'। তাঁহার কাব্যের গোড়া পত্তন হয় এই ডায়ারিতেই।

বোলপুরে বাগানের প্রান্তে একটি নারিকেল গাছ ছিল। তাহারই তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া তিনি এই কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবি বলেন কাব্যটাতে বীররসের অভাব ছিল না কিন্তু তৎসত্ত্বেও "উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।"

১৩ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার জন্য একটি কবিতা লিখেন।[১] কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলায় উপহার'। অমৃতবাজার তখন ইংরেজী ও বাংলা—এই দুই ভাষায় প্রকাশিত হইত। এই দ্বিভাষিক পত্রিকার ১২৮১ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখের সংখ্যায় কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

হিন্দুমেলায় উপহার

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ই ফাল্গুন ১২৮১

১

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়!

১ 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৩৮, পৃ. ৫৮০-৮১ দ্রষ্টব্য

২

স্তবধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত চাঁদের কিরণ—
রজতধারায় শিখর কানন
সাগর উরমি, হরিৎ প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিল ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিল ভাল,

শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয় এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভালো।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাইনা দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্মভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সেদিন যবে পৃথ্বীরাজ
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সেদিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নী সম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটীর সহিত মিশায়ে গেছে।

১৫

আবার সেদিন (ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারতভূমি

কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির। দেখেছি নয়নে।
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা।

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারতভূমি,
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আস্থক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র স্থর্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'The Indian Daily News' পত্রিকা হইতে উল্লিখিত কবিতা সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায়,—১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি (১২৮১ ফাল্গুন) হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে কবি তাঁহার স্বরচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[১]

১ "The Hindoo Mela.—The Ninth Anniversary of the Hindoo Mela was opened at 4 P. M. on Thursday the 11th instant, at the

এই বিবরণে রবীন্দ্রনাথের বয়স পনের বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বস্তুত তখন তাঁহার বয়স ছিল তের বৎসর নয় মাস, পনের বৎসর নহে। ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য জনসভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অনেকের ধারণা এই 'হিন্দুমেলায় উপহার'ই তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতা। বস্তুত তাহা নয়। ১২৮১ সনের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথের রচিত 'অভিলাষ' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রচনায় লেখকের নাম ছিল না।

তবে উহা যে দ্বাদশবর্ষবয়স্ক একটি বালকের রচিত এ কথা লেখা ছিল। কবিতাটি মুদ্রিত হইবার কালে কবির বয়স ছিল ১৩ বৎসর ৭ মাস। কিন্তু ইহারও পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম" নাটকে কবির রচিত নিম্নলিখিত গানটি প্রকাশিত হয়:

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।

wellknown Parsee Bagan······on the Circular Road by Raja Komul Krishna Bahadoor, the President of the National Society.

Baboo Robindro Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15 had composed a Bengali poem on Bharut (India) which he delivered from memory".

টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তাহলে আসুক বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

পুরুবিক্রম নাটকের প্রকাশ-তারিখ ৯ই জুলাই ১৮৭৭। সুতরাং এ পর্যন্ত যতগুলি তথ্য পাওয়া গেল তাহা হইতে পুরুবিক্রমে প্রকাশিত এই গানটিকেই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত পদ্যরচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

'অভিলাষ' কবিতাটি মুদ্রণের তারিখ হিসাবে প্রথম না হইলেও রচনার কাল হিসাবে উল্লিখিত গানেরও পূর্ববর্তী।[১]

কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল

অভিলাষ

দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত

১

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

২

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,

১ 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

৩

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

৪

হিম ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে :
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

৬

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

৭

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে ?" তা নয় তা নয়,
"সুবর্ণ খনির মাঝে অন্ত কি তোমার ?"
তা নয় যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

৮

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে,
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না।

৯

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ,
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

১০

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

১১

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

১২

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

১৩

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

১৪

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

১৫

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

১৬

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

১৭

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

১৮

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

১৯

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

২০

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পরিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন

গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

২১

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

২২

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে ?"

২৩

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষাচয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

২৪

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ওপথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড ঐশ্বর্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

২৫

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

২৬

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত ম খা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

২৭

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে?

২৮

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

২৯

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে

পাপের কি শান্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

৩০

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর।

৩১

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

৩২

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

৩৩

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

৩৪

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

৩৫

দুর্য্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

৩৬

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

৩৭

বলি না হে অভিলাষ তোমার ওপথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

৩৮

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে

তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

৩৯

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে ?

ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা কাব্যানুবাদও এই রকম সময় লেখা হয়। 'সাহিত্যিক পরিবেশ' অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটক যখন লেখা চলিতেছে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। এই নাটকের জন্য 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন।[১]

এই গান রচনার ইতিহাস "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

রামসর্বস্ব (যিনি রবীন্দ্রনাথকে শকুন্তলা পড়াইতেন এবং ম্যাকবেথ অনুবাদ করাইতেন) এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুইজনে রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘরের পাশের ঘরে বসিয়া "সরোজিনী"র প্রুফ সংশোধন করিতেন। প্রুফ রামসর্বস্ব জোরে জোরে পড়িতেন। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর হইতে সব শুনিতে পাইতেন এবং মাঝে মাঝে কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয় সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের একটা দৃশ্য এই নাটকে আছে। গ্রন্থকার সে দৃশ্যের জন্য একটি গদ্য বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রুফ দেখার সময় পাশের

১ পৃ. ১২৫-১২৬ দ্রষ্টব্য

ঘর হইতে তাহা শুনিয়াছিলেন। ঐ গদ্যবক্তৃতা ঐ স্থানের উপযোগী হয় নাই বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি নিজেই আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, গদ্য রচনার স্থলে একটা পদ্য রচনা দেওয়া হউক।

> "গদ্যরচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না।"[১]

প্রস্তাবটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপেক্ষণীয় মনে হইল না, কিন্তু তখন নূতন করিয়া কবিতা রচনা করিবার মত সময় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন এই গানটি রচনা করিয়া দিলেন। এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করিলেন যে রামসর্বস্ব এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উভয়েই বিস্মিত হইয়া গেলেন। গানটি এই :

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্‌রে যবন শোন্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই॥

১ "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি"

সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই !
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান ॥
ত্যাখ্রে যবন ! ত্যাখ্রে তোরা !
কেমনে এড়াই কলঙ্ক ফাঁসি ;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই
তবু না হইব তোদের দাসী ॥
আয় আয় বোন ! আয় সখী আয় !
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায় ;
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ ।
ত্যাখরে জগৎ মেলিয়ে নয়ন
ত্যাখরে চন্দ্রমা ত্যাখরে গগন
স্বর্গ হতে সব ত্যাখ দেবগণ
জ্বলন্ত অক্ষরে রাখগো লিখে ॥
স্পর্ধিত যবন তোরাও ত্যাখ্রে
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুতসতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনলশিখে ॥

"সরোজিনী" নাটক প্রকাশের পর হইতে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যচর্চার আসরে রবীন্দ্রনাথও বয়স্ক সভ্যদের সঙ্গে সমভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বলা হইয়াছে :

> "সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি।"

পনের ষোলো বৎসরের বালক ভ্রাতাকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গী করিয়া লওয়া একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ভ্রাতার মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতখানি ছিল অন্য প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্যের শিক্ষায় এবং ভাবের চর্চাতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনিষ্ঠভ্রাতার বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। জ্যোতি দাদার সহিত অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহার ভিতরকার সকল প্রকার সংকোচ কাটিয়া গিয়াছিল। এই স্বাধীনতার ফলে তাঁহার জীবনে যে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

> "প্রখর গ্রীষ্মের পরে যেমন বর্ষার প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। ··· শাসনের দ্বারা পীড়নের দ্বারা কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি

নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।"[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে "রবিকে প্রমোশন দিয়া" তাঁহাদের সমশ্রেণীতে তুলিয়া লইলেন তাহার প্রথম পরিচয় 'ভারতী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। ভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে একটি সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠার কল্পনা জাগে। রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয় চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই কল্পনাকে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথও এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাবিত পত্রিকার 'ভারতী' নাম তিনিই দিলেন।[২] সম্পাদক করা হইল দ্বিজেন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথও সম্পাদক-চক্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে; রবীন্দ্রনাথ এই সংখ্যা হইতেই ঐ পত্রিকাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। সাধারণো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করিয়া ভারতী পত্রিকা মাসে মাসে বাহির হইতে লাগিল। গান, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা—রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনায় ভারতীর পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে থাকিল। প্রথম তিন বৎসরের ভারতী পত্রিকায় কবির যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

১ "জীবনস্মৃতি"

২ প্রথমে নাম দিয়াছিলেন 'সুপ্রভাত', কিন্তু এ নাম সকলের অভিমত না হওয়ায় পরিবর্তন করিয়া 'ভারতী' নাম দেন।

"মেঘনাদবধ কাব্য" সমালোচনা শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪

"ভিখারিণী" গল্প শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

"করুণা" উপন্যাস আশ্বিন-পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৮৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৫। এ উপন্যাস শেষ হয় নাই।

"কবিকাহিনী" কাব্য পৌষ-চৈত্র, ১২৮৪

"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" বৈশাখ-পৌষ, ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮৬ : বৈশাখ-শ্রাবণ ১২৮৭

"ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"

সজনি গো শাঙন গগনে ঘোর ঘন ঘটা	আশ্বিন	১২৮৪
গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে	অগ্রহায়ণ	"
বজাও রে মোহন বাঁশী	পৌষ	"
হম সখি দারিদ নারী	মাঘ	"
সখিরে পিরীত বুঝবে কে	ফাল্গুন	"
সতিমির রজনী	ফাল্গুন	"
বাদর বরখন নীরদ গরজন	চৈত্র	"
বার বার সখি বারণ করনু	বৈশাখ	১২৮৫
মাধব না কহ আদর বাণী	"	১২৮৬
দেখ লো সজনী চাঁদনি রজনী	"	১২৮৭

পূর্বেই বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে বেনামা এবং অনামা রচনা অনেক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতী পত্রিকাতেও এরূপ অনেক রচনা মুদ্রিত হয়। ভানুসিংহের পদগুলিই তাহার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম না দিয়া যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত অধিকাংশই বিভিন্ন পুরাতন পত্রিকার কীটদষ্ট পাতার অন্তরালে এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

অনামা রচনার বিপদ এই যে ভাষা ছন্দ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক প্রমাণ ছাড়া রচয়িতার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বাহ্য প্রমাণ থাকে না। ইহার ফলে অনুমানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। এবং এই অনুমান যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে যে রচনাগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি যে তাঁহার নিজের হাতের রচনা ইহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর কয়েকটি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল।

অনামা রচনার মধ্যে 'প্রকৃতির খেদ' নামক নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৭৯৭ শকাব্দের (১২৮০ সাল) আষাঢ় সংখ্যায়।[১] লেখকের নাম ছিল না, উহার স্থলে লিখিত ছিল 'বালকের রচিত'। ১২৮০ সালে আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের বয়স বার বৎসর দুই মাস। ঐ বৎসরের ২৫ শে বৈশাখ কবির বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয়। নিশ্চয় তাহারই কিছু পূর্বে বা পরে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। সুতরাং উহাকে দ্বাদশ বৎসর বয়সের রচনা বলা যাইতে পারে। ভাষা ছন্দ এবং বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে কবিতাটি দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক কবির অসামান্যত্বই প্রতিপন্ন করে।

প্রকৃতির খেদ

বালকের রচিত

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
    অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
    ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে॥

১ 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ দ্রষ্টব্য

ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে,
নির্ঝরের একধারে, দুলিছে তরঙ্গভরে
ঢলে ঢু'ল পড়ে জলে প্রভাত পবনে।
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলক-রাশি
কবরী কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ো তান,
শোভনা প্রকৃতি দেবী গান ধীরে ধীরে ;
নলিনী-নয়নদ্বয়, প্রশান্ত বিষাদময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে॥
অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তাহলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।
তাহলে কি হিমালয়, গর্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান॥
তাহলে কি শতদলে তোর সরোবর-জলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুম রাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিতো কিলো অমন সুবাস।
তাহলে ভারত তোরে সৃজিতাম মরু করে্য
তরুলতা জনশূন্য প্রান্তর ভীষণ,
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলন॥

থামিল প্রকৃতি কার অশ্রু বরিষণ।
গলিল তুষার মালা তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহার বিন্দু নির্ঝরিণী জলে
কাঁপিল পাদপ-দল উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে॥
ঈষৎ আঁধার রাশি গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিল নব অরুণের কর,
মেঘরাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বত-শিখর॥
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি সুন্দরী।—
কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ অভাগা ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর ফেলো দেনা অলঙ্কার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরত-ভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম কমণ্ডলে॥
উচ্চশির হিমালয়; প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদ ভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি
দ্যাখ্ আর্য্য সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্য পটে রয়েছে চিত্রিত।
দ্যাখ্ দেখি তপোবনে ঋষিরা স্বাধীন মনে
কেমনে ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥

কেমন স্বাধীন মনে গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য্য উঠি প্রাতঃকালে তাড়ায় আঁধার জালে
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয় কর ॥
তখন কি মনে পড়ে ভারতী মানস সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝঙ্কারিত।
শুনিয়া ভারত পাখী গাইত শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত।
সে সব স্মরণ কর্য্যে কাঁদ্‌লো আবার।
আয়রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর্‌।
ধূর্জটি! সংহার শিঙ্গা বাজাও তোমার
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়্যে যাক ভারতের বেশ,
ভারত সাগর রুষি উগর বালুকা রাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক সমস্ত প্রদেশ।
বলিতে নারিল আর প্রকৃতি সুন্দরী,
ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি ॥
জাহ্নবী উন্মত্ত পারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ডবেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গ ভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর
সুচঞ্চল সমীরণে উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবিব ছটা হল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত ॥

দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে॥
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ॥
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল যাইত শুকায়ে
তপন-কিরণ-তপ্ত মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ॥
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল,
না দেখি মনুষ্য মুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান, অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত, আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান॥
তাহলে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল,
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল॥
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হলে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হলে ত কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা॥

অরণ্যেতে নিরিবিলি সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা,
দেখি মরীচিকা হায় আনন্দে বিহ্বল প্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না ॥
আর্য্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন,
হরষে প্রফুল্ল মুখে, হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন,
ঋষিগণ সমস্বরে অই সাম গান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্য ভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি ॥
সরস্বতী নদীকুলে, কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত ॥
সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে,
আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ-আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে ; একটি প্রদীপরূপে
জ্বলিতিস তুই আহা, নাহি পড়ে মনে ?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।

এই অমানিশা তোর আর কি হবেনা ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মত সুখ-সূর্য্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এইরূপে॥
তোর ভাগ্য চক্র শেষে, থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলো দাও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন করো দিক্ ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগর বালুকা রাশি
মরুভূমি হয়ো যাক সমস্ত প্রদেশ॥

সংগীত শিক্ষা ও রচনা

আট নয় বৎসর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের গান শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। হেমেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার কন্যাকে দেশী ও বিলাতী উভয়বিধ সংগীতেই পাকা করিয়া তুলিতেছেন। দেশী গান শিক্ষা আরম্ভ হয় বিষ্ণুর কাছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কাছেই প্রথম গান শিক্ষা করেন। 'ছেলেবেলায়' কবি লিখিয়াছেন :

"এদিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল।"

বিষ্ণু যে গান দিয়া বালকের সংগীত শিক্ষা শুরু করেন তাহাকে ঠিক গান বলা চলে না। সেগুলা ছড়ার ধরনের কবিতা। কবি লিখিয়াছেন :

"বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন এখনকার কালের নামি বা বেনামি ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা বোধ করতেন। সেগুলো পাড়া-গেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়।"

এই ছড়ার কয়েকটি নিদর্শন ছেলেবেলায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে দুই একটি তুলিয়া দিতেছি :

"এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি
ঠাকুর ঝি,
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুর ঝি।"

আর একটি ছড়ার কয়েকটি লাইন :

"চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে জোনাক জ্বালে বাতি

মোগল পাঠান হদ্দ হল

ফার্সি পড়ে তাঁতি।"

হেমেন্দ্রনাথ, যিনি পড়াশোনার তত্ত্বাবধান করিতেন, যেমন লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে তেমনি সংগীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাভাষার উপযোগিতা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য হিন্দীগান অপেক্ষা বাংলাছড়া দ্বারা শিশু শিক্ষার্থীর সংগীতশিক্ষা সহজ হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই ছড়া দিয়া গান শেখার আর একটা সুবিধা এই যে তাল রাখিবার জন্য বাঁয়াতবলার বোলের শরণাপন্ন হইতে হয় না। ছড়ার ছন্দের সহজ তাল আপনা-আপনিই যেন নাড়ীতে নৃত্য করিতে থাকে। কবি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

"শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায় এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।"

দেশে তখনও হারমোনিয়মের আমদানি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে তম্বুরায় গান অভ্যাস করিয়াছেন।

কিন্তু শিক্ষার দ্বারাই যে তিনি গান শিখিয়াছিলেন তাহা নহে। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার একটি স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তাহা ছাড়া ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া যেমন সাহিত্যের তেমনি সংগীতের চর্চার পক্ষেও অনুকূল ছিল। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরবাড়িতে উৎসবের ঢেউ বহিয়া যাইত। কাব্য এবং সংগীতই এই উৎসবের প্রধান উপকরণ ছিল। বড়দের সভায় বালকের প্রবেশাধিকার না থাকিলেও দূর হইতে তিনি সেই উৎসবের স্পর্শ পাইতেন। এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন :

"বেশ মনে পড়ে বড়দাদা একবার কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্সল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যেরও কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর ব'লো না আর ব'লো না
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে।
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা
হাসবে লোকে--
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।

এত বড়ো হাসির কথাটা যে কী তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু এক সময় জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা দোলা খাইত।"

ভ্রাতারা সকলেই সংগীতে অনুরাগী। বাহিরের বড় বড় গায়ক-বাদকেরও ঠাকুরবাড়িতে গতিবিধি ছিল। বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠবাবুর কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে।

"তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্য সঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের বিশ্রাম ছিল না।"

বালক রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরি' এই গানটি শ্রীকণ্ঠবাবু রবীন্দ্রনাথকে শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখে সকলকে শুনাইবার জন্য তাঁহাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। রবীন্দ্রনাথ গান ধরিতেন আর তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন। এবং গানের যেখানে প্রধান ঝোঁক সেখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া নিজে যোগ দিতেন এবং বারংবার সেটা আবৃত্তি করিতেন।

অজানা অচেনা যে সকল গায়ক বাদক আসিতেন তাঁহাদেরও অনেক গান এবং গানের সুর বালকের মনে দাগ রাখিয়া যাইত। এই রকম একজন অপরিচিত গায়কের সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন :

"সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমতো রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকাল বেলার সুরে চলত 'বঁধুয়া হমারি রে'।"

যেমন লেখাপড়ায় তেমনি গানে নিয়মের বন্ধন তিনি কখনও মানিয়া লইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :

"আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর।"

সৃষ্টি করা যাহার ধর্ম বাঁধা খাতে সে চলে না। রবীন্দ্রনাথের সেই সৃজনী প্রকৃতিই তাঁহাকে ওস্তাদির হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। আজ

ওস্তাদেরা তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করুন কিন্তু তিনি যে নব নব সুরে নব নব সংগীত রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়নদীতে গানের তরণীখানি ভাসাইয়া গেলেন, সে তরণী বাঙালীকে আনন্দমহাসমুদ্রের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

অনিয়মের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল এবং গৃহের সংগীত-পরিবেশ সেই শিক্ষায় সবাধিক সহযোগিতা করিয়াছিল। ছেলেবেলায় লিখিয়াছেন :

> "যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্ম সংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজ গামিনীরে, আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি।"

এইভাবে শিশুকাল কাটিল অনিয়মের গান শেখায়। তাহার পর যখন কিছু বয়স হইয়াছে তখন যদুভট্ট নামে একজন বড়ো ওস্তাদ ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া বসিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে গান শিখাইবেন বলিয়া জেদ ধরিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি নিয়ম বন্ধন দেখিলেই তাঁহার প্রকৃতি বিমুখ হইয়া উঠিত সুতরাং যদুভট্টের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও কবির তেমন করিয়া গান শেখা হইল না। কিন্তু এই গায়কের মুখে শুনিয়া যে সব গান তাঁহার ভাল লাগিত সেগুলি তাঁহার মনে মনে গাঁথা হইয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথের ধারণা "চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস পাকা না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে" তিনি নাকি পারেন নাই।

যাহাই হউক শিক্ষা পাকা না হইলেও তিনি নূতন নূতন গান রচনা করিয়া তাহাতে নূতন নূতন সুর সংযোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সে রচিত বহু গানের নিদর্শন তৎকালীন কাব্য ও নাটকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ ছাড়া কালমৃগয়া এবং বাল্মীকিপ্রতিভা নামক গীতিনাট্য তো আছেই।

ষোল সতের বৎসর বয়সেই তিনি স্বরচিত গানে সুর যোজনা করিতে আরম্ভ করেন। এই কাজে তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

দেশে দেশী গান শিক্ষার পাট এইরূপে সমাপ্ত হইলে পর রবীন্দ্রনাথ বিলাত গেলেন। সেখানে বিলাতী গানও শিক্ষা করিলেন। বিলাত-যাত্রার পূর্বে কবি মূরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ দেখিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু সেই বইয়ের কবিতাগুলি মুগ্ধভাবে আবৃত্তি করিতেন। কবি তখনও এই কবিতার সুর শুনেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইত এই আইরিশ মেলডীজ সুরে শুনিয়া শিখিবেন এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়-বাবুকে শুনাইবেন। বিলাতে গিয়া তিনি এই গান শুনিলেন এবং কতক-গুলি শিখিয়াও ফেলিলেন। কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত তাঁহার থাকে নাই। আইরিশ মেলডীজ ছাড়াও অন্যান্য বিলাতী গান তিনি শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্মীকিপ্রতিভায় দেশী ও বিলাতী উভয়বিধ সুরের গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শুধু সুর আয়ত্ত করিবার নয়, সুরে গান রচনা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার অসামান্য রকমের ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাইয়া নূতন সুর তৈয়ার করিতেন। আর রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সুর-গুলিকে কথা দিয়া বাঁধিতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আছে :

"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেনসিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি সুর রচনা করিতাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।...... সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই রীতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা, সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।"

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন ছেলেবেলায় :

"তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।··· ছাদের ঘরে এল পিয়ানো।.. এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন : আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই তখনই সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখার কাজ ছিল আমার।"

এইভাবেই তাঁহার গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি শুরু হয়।

সংগীতচর্চায় মহর্ষি পুত্রকে সবিশেষ উৎসাহ দিতেন। পৌত্রী প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং কনিষ্ঠ পুত্রের গান তাঁহার প্রিয় ছিল। মহর্ষি বলিতেন—"রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল।" উপনয়নের পর বালক রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করেন। প্রবাসে অবস্থান কালে তিনি পিতাকে ব্রহ্মসংগীত গাহিয়া শুনাইতেন। জীবনস্মৃতিতে কবি সেই পুরাতন দিনের কথা লিখিয়াছেন ঃ

"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শুনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে কভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে, কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন,—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

এই প্রসঙ্গে কবি পরবর্তীকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কবি কতকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে হারমোনিয়মে বসাইয়া মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে সব কয়টি গান একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনও কোনও গান দুইবারও গাহিতে হইয়াছিল। গান গাওয়া শেষ হইলে মহর্ষি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক পুত্রের হাতে দিলেন।

এই পুরস্কারের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম।"

মুদ্রিত অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম [১] পরিচয় বাহির হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেইশ বৎসর। এই বয়সেই তাঁহার সংগীত ও কবিতা রচনার খ্যাতি দেশের মধ্যে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গানে নূতন সুরের ঝংকার এবং নূতন ভাবের সন্নিবেশ হওয়ায় তাহা বাঙালীর কাছে বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। প্রণয়সংগীতে বিশুদ্ধি আনয়ন করিয়া তিনি তাহাকে শিষ্টজনসভায় স্থান দিয়াছেন। শুধু কবি বলিয় নয় গায়ক হিসাবেও তিনি সেই বয়সেই যশস্বী হইয়াছেন।

তেইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ কবির জীবনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়টির কথা বলিতেছি তাহা "সংগীতমুক্তাবলী" নামক সংগীত-সংগ্রহের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ :

"এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সংগীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুরবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার ব্রহ্মসংগীত জাতীয় সংগীত এবং প্রণয়সংগীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সংগীতে অনেকরকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিস ইহা হইতে বাহির হইয়াছে এবং আরও কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয়সংগীত রচনা করিয়া রবীন্দ্রবাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সংগীত-রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।"

১ 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৪৮ দ্রষ্টব্য

দেশানুরাগের দীক্ষা

বঙ্গের তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। কিঞ্চিন্ন্যূন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এমন অবস্থারও উদ্ভব হয় যখন স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথের অগ্নিবর্ষী লেখনীর প্রদীপ্ত প্রভায় কবি রবীন্দ্রনাথের অমৃতনিষ্যন্দিনী প্রতিভা ম্রিয়মাণ মনে হইয়াছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন স্বাদেশিক রচনাসমূহের মধ্যে তাহার অমূল্য উপকরণ আছে।[১]

রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে রাজনীতির কোলাহলময় প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চ হইতে কিছুদূরে অবস্থান করিলেও যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যশালায় তাঁহার কর্মধারা অব্যাহত ছিল। উত্তেজনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্ষণেকের মত বিস্ফুরিত হইয়া পরক্ষণেই নির্বাপিত হইয়া যায় কিন্তু পরাধীন দেশের নিপীড়িত মানবসাধারণের প্রাত্যহিক দুঃখ-দুর্দশার নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে

১ "It was in those stirring days that the masculine prose of Rabindranath's pen burst forth in its splendid virility and almost eclipsed the poet himself. And I can say with the deepest conviction that the patriotic youngman of the present day cannot do better than study the magnificent discourses of Rabindranath of a quarter of a century ago, his *Swadeshi Samaj*, his *Desha Nayak*, his *Samasya*, his *Path O Patheya* and other pieces now published in the collections *Raja Praja*, *Swadesh*, *Samaj* and *Samuha*; if the young man does it he will equip himself far more effectively for political life than by idly imbibing the inane froth that issues out of the daily press to day." Sir P. C. Roy, "Golden Book of Tagore."

যে বেদনার বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহার প্রচণ্ডতা কখনও শান্ত হইবার সুযোগ পায় নাই।

এই দেশাত্মবোধের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে একেবারে রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে গিয়া উপনীত হইতে হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে যে যুগসন্ধির সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন তাহার তিন বৎসর পরে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব হইতেই দেশে একটা বিপ্লবের ঝটিকা উত্থিত হয়। সে ঝড় শুধু রাজনীতির পালেই লাগিয়াছিল তাহা নয়; কি ধর্মনীতি কি অর্থনীতি কি সমাজনীতি সব নীতির তরণীই এই ঝঞ্চাবর্তে বিচলিত হইয়া কূল অন্বেষণ করিতেছিল। রাজনীতির সহিত অন্যান্য সর্বপ্রকার আন্দোলনের যোগ চিরকালই আছে তখনও ছিল এবং অন্যান্য আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসারে সাহায্য করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় জন্মের পর তাহার বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এই সমস্ত আন্দোলন হইতে ঠাকুরপরিবার দূরে ছিলেন না। সামাজিক এবং ধর্মসম্পর্কীয় সংস্কারে ঠাকুরপরিবার চিরকালই অগ্রণী ছিলেন; দেশানুরাগও তাঁহাদের মধ্য প্রবল ছিল। স্বদেশপ্রেমের যে পবিত্র আদর্শ মহর্ষির মনে সদা জাগরূক ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের মনে তাহা সঞ্চারিত হয়।

> "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে সেকালে ভূম্যধিকারিগণের একটি

সভা ছিল! এই সভার নির্ভীক এবং সুস্পষ্ট আলোচনা তদানীন্তন রাজপুরুষগণ শ্রুতিসুখকর বলিয়া গণ্য করিতেন না। লাটসাহেব এই সভাকে "notoriously outspoken and independent in their utterances" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১] দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভারই সম্পাদক।

ভারতসম্পর্কে য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের সহিত কখনও তাঁহার মতের মিল হয় নাই। পরাধীন জাতির প্রতি তাঁহাদের অভিভাবক-সুলভ মনোভাব দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অপমানজনক বোধ হইত। এইজন্য য়ুরোপীয়গণের সহিত তাঁহার কখনও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পায় নাই।[২]

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করেন, পরে ইহারই নাম হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। চার বৎসর পরে এই সভা হইতে তিনি অক্ষয়কুমার দত্তর সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৩ অব্দে তিনি নিজে এই পত্রিকার সম্পাদক হন। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও বহুকাল এই পত্রিকার সম্পাদন করেন। দেশে স্বদেশীভাব সঞ্চারে এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য

১ Sir Richard Temple, Lt. Governor of Bengal (1874-1877)

২ "দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজদের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—'The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans' দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I হইতেন।" "রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত", পৃ. ১১৩

করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল নানা কাহিনী এই পত্রিকায় বাহির হইত।

এইভাবে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহাই ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মনে দেশানুরাগের অনুভূতির উদ্রেক করে। 'হিন্দুমেলা'য় তাহার সূচনা প্রত্যক্ষ করি।

রবীন্দ্রনাথ যখন ছয় বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র, তখনই হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয়। এই মেলা রাজনারায়ণ বসুর "প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।"[১] ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। গণেন্দ্রনাথ[২] এই মেলার সম্পাদক হন। দেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন, দেশীয় ব্যায়ামাদির পুনঃপ্রচলন, দেশীয় ভাবের পুনরুদ্বোধন—এই সব ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য মেলার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের[৩] সম্পাদনায় 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করেন। হিন্দুমেলার পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের সহিত যে দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগ ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকাল পরে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে যে দেশমাতৃকাকে বন্দনা করিয়াছেন এই সময় হইতেই তাঁহার মৃন্ময়মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ

১ "রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত", পৃ. ২০৮

২ দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রনাথের পুত্র

৩ "নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের Father of Physical Education অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়াম চর্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত।" "রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত", পৃ. ১৮৫

"ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

এই মেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হয়, স্বদেশ হইল তাহার বিষয়বস্তু। হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনে "দেশের স্তবগান গীত" এবং "দেশানুরাগের কবিতা পঠিত" হইতে থাকে। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেলার দ্বিতীয়বার্ষিক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'গাও ভারতের জয় গানটি গীত হইয়াছিল।[১]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত।...এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদাদার লেখা 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে', বড়দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'।"[২]

হিন্দুমেলার জন্য রচিত সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত "মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হইয়াছিল।[৩]

এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল অতিবাহিত, সুতরাং জাতীয়ভাবে তাঁহার হৃদয় যে প্রথম হইতেই অনুপ্রাণিত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বাল্যজীবনের এই পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করিলেই

১ "জীবনস্মৃতি" ও "রবীন্দ্রজীবনী"

২ 'প্রতিভাষণ'

৩ "এই মহাসংগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক! হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সহিত বাজিতে থাকুক।"

দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যসাধনার প্রারম্ভকালে স্বাদেশিকতাকেই প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কি কারণে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের জন্য রচিত "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ", ১২৮১ সালে হিন্দুমেলায় পঠিত "হিন্দুমেলার উপহার," ইহার দুই বৎসর পরে হিন্দুমেলায় পঠিত দিল্লিদরবার সম্বন্ধীয় কবিতা এবং আরও অনেক কবিতা ও স্বদেশী সংগীত বালক কবির তৎকালীন মানস-লোকের পরিচয় প্রদান করে।

উল্লিখিত দিল্লিদরবার সম্বন্ধীয় কবিতার কোনো ছত্র কবির মনে ছিল না। জীবনস্মৃতিতে শুধু এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে লর্ড লিটনের সময়ে তিনি এই কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া যখন তাহা পড়েন তখন শ্রোতাদের মধ্যে কবি নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অনেক পরে নবীন সেন মহাশয় একদিন কবিকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, উক্ত কবিতাটি মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই তিনি শুনিয়াছেন। তবে "কবিতাটির ভাব এইরূপ ছিল যে প্রাচীনকালে সম্রাটরা এই রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন; সে সব উৎসবের দিনে ভারতের কি দশা ছিল, আর আজ সেই দিল্লিতে কি দেখিতে রাজারা উপস্থিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এইটুকু মাত্র স্মরণ আছে···।"[১]

কবিতাটি মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই কবির ধারণা ছিল, কাজেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় কবিতাটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "স্বপ্নময়ী" নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের মুখে যে স্বগত কবিতাটি

১ "রবীন্দ্রজীবনী", পৃ. ৪৯

দেওয়া হইয়াছে উহা সেই কবিতা। উহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা এ সন্দেহ প্রথমে প্রকাশ করেন শ্রীযতিনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখানো হইলে তিনি উহাকে হিন্দুমেলায় পঠিত সেই বাল্য-রচনা বলিয়া চিনিতে পারেন। কবিতার মধ্যে যে "মোগল" শব্দ আছে প্রথমে তাহা ছিল না, প্রথমে ওই স্থলে ছিল "ব্রিটিশ"। নাটকের সংগতিরক্ষার্থ "ব্রিটিশ"-এর পরিবর্তে "মোগল" করা হইয়াছে।

১৩০৯ সালে লর্ড কর্জনের সময় যে দিল্লিদরবার অনুষ্ঠিত হয় তাহার উদ্‌যোগকালে রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১] তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪১ বৎসর। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পনের বৎসর বয়স্ক বালকের চিন্তাধারার সহিত একচল্লিশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার অদ্ভুত মিল ছিল। লর্ড লিটনের দিল্লি-দরবার উপলক্ষে রচিত কবিতার যে মর্মাংশ উপরে লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি তুলনায়।

"দিলদরাজ মোগল সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিন নাই সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল এজেণ্টের রাহুগ্রাসে কবলিত; সাম্রাজ্য চালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত শিখ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন, আকস্মিক উপদ্রবের মতো একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরিত হইয়া উঠিল,—তাহার পর সমস্ত শূন্য সমস্ত নিষ্প্রভ। পূর্বকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির

১ 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১৩০৯

করিতেন, তাহা নহে,···সে সকল উৎসব বাদশাহ নবাবদের ঔদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহস্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা ও আনন্দ দূর দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষ্যে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে?"[১]

ইহারও বহু দিন পরে অন্য একটি প্রবন্ধে কবি এই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করেন। তিনি বলেন :

"···দরবার জিনিসটা প্রাচ্য,—পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন, তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে? সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সেটা হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা।"[২]

অসংযত ভাবাবেগ এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাষার অজুহাতে কবি বাল্য বয়সের বহুরচনাকে সাহিত্য শ্রেণীতে অপাংক্তেয় বলিয়া বর্জন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত যে অকুণ্ঠভাবে মানিয়া লওয়া যায় না—এইখানে তাহার একটি প্রমাণ রহিল। পনের বৎসর বয়সের রাষ্ট্রনৈতিক মত তিনি প্রৌঢ় বয়সেও বর্জন করেন নাই। আত্মমত

১ 'অত্যুক্তি', ১৩০৯

২ 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য

বলিয়া বর্জন করেন নাই, তাহা নহে; গ্রহণের যোগ্য রক্ষণের যোগ্য বলিয়াই তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।

হিন্দুমেলা ছাড়াও আর একটি স্বাদেশিক অনুষ্ঠানের সহিত বালক রবীন্দ্রনাথের যোগ ঘটিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে সেকালে একটি সভা স্থাপিত হয়। "বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক প'ড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল।"

বস্তুত এই সভার সভ্যগণ এমন কোনও কাজই করিতেন না যাহা রাজদ্রোহ বলিয়া দণ্ডনীতির আমলে আসিতে পারে। তাঁহারা কখন কোথায় যাইতেন কি করিতেন তাহা আত্মীয় এবং অভিভাবকেরা পর্যন্ত জানিতে পারিতেন না। ইহাতেই একটা রহস্যঘন উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এই সভার বালকদের কীর্তি কলাপকে বীরত্বের প্রহসন বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। বীরত্বের প্রতি মানুষের যে একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে এই সভার সভ্যগণ "সভা করিয়া কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া" তাহা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। বীরত্ব প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক পথ বন্ধ থাকাতে নবীন বীরবৃন্দ রুদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহে ঋক্ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভাতের স্বপ্ন না কি নিষ্ফল হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনের প্রভাতকালে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া সেই স্বপ্নকে যে কতখানি সফল করিয়াছিলেন তাহা দেশবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবেন।

"সংগীতের দ্বারা বক্তৃতার দ্বারা তিনি দেশবাসীর চিত্তকে দেশের

আদর্শ ও সত্যের দিকে জাগাইয়া তুলিলেন। তখন স্বাদেশিকতার জীবনের মধ্যাহ্নকাল। কবির বীণা তখন রুদ্রস্বরে বাঁধা ; তিনি ক্রমাগত ত্যাগের, কঠিন কর্মভার গ্রহণের কথাই আমাদিগকে শুনাইতেছিলেন।" [১]

তাঁহার পরিণত বয়সের সাহিত্য অনুশীলন করিতে হইলে বাল্য-জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এইজন্যই এত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কত কবিতা কত গল্প কত প্রবন্ধের বীজ যে বাল্য বয়সের উপেক্ষিত ধূলিরাশির মধ্যে প্রথম উপ্ত হইয়াছিল, অভ্রভেদী মহীরুহের সুদূরপ্রসারী শাখা পল্লবের গহন জটিলতার মধ্যে তাহার স্মৃতিটি পর্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে আকস্মিকের আদিতেও কারণ আছে, অমূল তরু পৃথিবীর মাটিতে জন্ম গ্রহণ করে না।

১ **অজিতকুমার চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ"**

শ্রোতা ও সমালোচক

রবীন্দ্রনাথ বাল্য বয়স হইতেই তাঁহার কবিতার বহু শ্রোতা পাইয়াছিলেন—ইঁহারা সকলেই নিবাক থাকিতেন এমন নহে কবিতা শ্রবণ করিয়া অনেকে সমালোচনাও করিতেন। অনুকূল সমালোচকের সংখ্যা সেকালেও কম ছিল না—তবে প্রতিকূল আলোচনাও অনেকের মুখে শোনা যাইত।

শিশু কবির একজন বৃদ্ধ শ্রোতা ছিলেন তাঁহার নাম শ্রীকণ্ঠবাবু। শ্রীকণ্ঠ-বাবুর স্বভাবটি ছিল অতি সুন্দর। তাঁহার মাথা ভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো, দন্তহীন মুখটি স্নিগ্ধ সারল্যে মণ্ডিত। দুই চক্ষু সর্বদাই হাস্য কৌতুকে সমুজ্জ্বল। হাস্য-পরিহাসে আমোদ-আহ্লাদে তিনি বয়সের বাধা মানিতেন না। বালক বৃদ্ধ সকলেই ছিল তাঁহার সমবয়সী। তিনি যেমন মহর্ষি দেবের তেমনি তাঁহার পুত্রদেরও বন্ধু ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর কথা পড়িলেই "বউঠাকুরানীর হাট"-এর বসন্তরায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুই চরিত্রের মধ্যে মিল এতই অধিক যে মনে হয় কবি শ্রীকণ্ঠবাবুর ছাঁচে বসন্ত রায়ের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি তিনি ইচ্ছাক্রমে তাহা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই বসন্ত রায়ের চরিত্রে শ্রীকণ্ঠবাবুর ছায়া পড়িয়াছে।

এই শ্রীকণ্ঠবাবু নবীন কবির নবীনতম কবিতাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কবিতা লেখা হইলেই বালক কবি শ্রীকণ্ঠবাবুকে তাহা শুনাইতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তাহা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কবির কবিতা এবং কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিতেন। এমন শ্রোতা পাইলে কবির উৎসাহ স্বভাবতই বাড়িয়া যায়। "কবিতা শুনাইবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মিলে না।"

শ্রীকণ্ঠবাবুকে কবিতা শুনাইবার আর একটি সুবিধা ছিল। তিনি যে কবিতা নিজে শুনিতেন তাহা আবার আর পাঁচজনকে না শুনাইয়া ছাড়িতেন না। সুতরাং কবিখ্যাতির বিস্তার লাভের পক্ষে শ্রীকণ্ঠবাবুর সহযোগিতা উদীয়মান কবির পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকণ্ঠ-বাবুর হাত দিয়া কোনও কোনও কবিতা মহর্ষিদেবের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিত।

কবি একবার দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়া শ্রীকণ্ঠবাবুকে শুনাইলেন। সেই পারমার্থিক কবিতায় সংসারের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠবাবু তাহা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন এ কবিতা পড়িলে মহর্ষিদেব বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। এই মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মহর্ষির কাছে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। কিন্তু ফলটা ঠিক আশানুরূপ ফলে নাই। "সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। বিষয়ের গাম্ভীর্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারে নাই।"

এই শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে তোলা কবি এবং তাঁহার দুই সহপাঠীর বাল্য-বয়সের একটি ছবি আছে। এই ছবি তোলার একটি ইতিহাস আছে।

ছবিটি তোলা হইয়াছিল একটি ইংরেজ ছবিওআলার দোকানে। বৃদ্ধ তিনটি বালককে সঙ্গে লইয়া দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানের মালিক যে সাহেবটি তাহার সঙ্গে শ্রীকণ্ঠবাবুর কিছুমাত্র আলাপ পরিচয় ছিল না। কিন্তু না থাকিলে কি হইবে? তাঁহার কাছে তো চেনা অচেনার কোনো ভেদ ছিল না। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহেবের সঙ্গে দিব্য আলাপ জমাইয়া তুলিলেন. শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় তাহাকে এমন জোর করিয়া বলিলেন যে, ছবিতোলার জন্য অত বেশি

দাম তিনি দিতে পারিবেন না, তিনি গরিব মানুষ, সস্তায় তাঁহার ছবি তুলিয়া দিতেই হইবে, যে, সাহেব আর না বলিতে পারিল না। সে সস্তায় ছবি তুলিয়া দিল।

শ্রীকণ্ঠবাবু ছাড়া কবির বাল্যরচনার অনুকূল সমালোচনা করিয়া তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন কাছারির আমলারা। সুতরাং তাহারাও শ্রীকণ্ঠ বাবুর মত শিশুকবির কবিতা নিয়মিত শুনিতে পাইতেন।

কবির বাল্যকালে কাব্যচর্চার উৎসাহ জোগাইয়াছেন আর একজন সুহৃদ—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইনি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী। ইনি যেমন পণ্ডিত তেমনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। ইনি নিজেও অনেক গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠবাবুর ন্যায় ইনিও বালকদের সঙ্গে বালকের মতই অকুণ্ঠভাবে মিশিতেন, তাহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিতেন, তর্কবিতর্ক করিতেন। তাঁহার প্রাচীন বয়স এবং অগাধ পাণ্ডিত্য বালকদের সভা জমাইবার পক্ষে কখনও অন্তরায় হয় নাই। ইঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সের লেখা কবিতা মাঝে মাঝে শুনাইতেন। ইনিও সে লেখার অজস্র প্রশংসা করিতেন।

বালককবির কবিতার আর একজন উৎসাহী শ্রোতা ও অনুকূল সমালোচক ছিলেন তাঁহার গুণদাদা। মহর্ষির কনিষ্ঠভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ [১]। গুণদাদা অর্থাৎ গুণেন্দ্রনাথ [২] তাঁহারই পুত্র। বিখ্যাত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ [৩] ও অবনীন্দ্রনাথ এই গুণেন্দ্রনাথের পুত্র।

১ জন্ম ১৮২০, মৃত্যু ১৮৫৪

২ জন্ম ১৮৪৭, মৃত্যু ১৮৮১

৩ জন্ম ১৮৬৭, মৃত্যু ১৯৩৮

এই গুণদাদা দুপুরবেলা আহারের পর কাছারিঘরে বসিতেন, বালক রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিয়া বসিতেন তাঁহার কোলের কাছে। গুণদাদা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা গল্প করিয়া করিয়া বলিতেন। কবিযশঃপ্রার্থী বালকের মনস্তত্ত্বটি গুণদাদার বেশ ভালরকম জানা ছিল। কবিতার খাতা পকেটে থাকিলে কবির ভাবগতিক দেখিয়া তিনি সহজেই টের পাইতেন এবং টের পাইলেই শুনাইতে বলিতেন। অমনি খাতা বাহির হইয়া পড়িত।

গুণেন্দ্রনাথ ভাইয়ের কাব্যের খুব সমজদার শ্রোতা ছিলেন—অর্থাৎ তাঁহার সব কবিতাই ভাল লাগিত এবং প্রশংসাবাদে তিনি কখনও কৃপণতা করিতেন না। এহেন গুণদাদাও কবিতার মধ্যে তেমন কিছু ছেলেমানুষি দেখিলে হাসিয়া উঠিতেন--সে হাসি যে কবির পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কবি একবার ভারতমাতা সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে কবিতার কোনো একটি লাইনের শেষে 'নিকটে' এই শব্দটি ছিল। ইহার সহিত ঠিক মিল খায় এমন একটি শব্দ পরবর্তী লাইনের শেষে দেওয়া আবশ্যক। অনেক খুঁজিয়াও কবি এমন শব্দ পাইলেন না যাহার দ্বারা মিলটাও বজায় থাকে অথচ অর্থও অসংগত না হয়। অগত্যা 'শকটে' এই শব্দটি লাগাইতে হইল। মিলের পক্ষে এস্থলে 'শকটে -এর আগমনে কোনও বাধা না থাকিলেও অর্থের দিক দিয়া 'শকটে'-এর পথ মোটেই সুগম ছিল না। কিন্তু কবির পক্ষে মিলের দায় বড় দায়।

গুণদাদা কবিভ্রাতার কাকলী শুনিতেছিলেন, হঠাৎ অবাঞ্ছিত স্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে 'শকটে' আসিয়া পড়াতে তিনি উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

আর একদিন এইরূপ এক বিপদ ঘটিয়াছিল। 'ন্যাশনাল পেপার'-এর

সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র। তিনি প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে আসিতেন। একদিন কবির বড়দাদা নবগোপালবাবুকে ভ্রাতার একটি রচনা শুনিতে বলিলেন। কবি নিকটেই ছিলেন। শ্রোতার মুখ হইতে সম্মতি বাহির হইবার পূর্বেই কবির পকেট হইতে নীল খাতাটি বাহির হইয়া পড়িল।

সেদিনকার কবিতার বিষয় ছিল—পদ্মফুল। পদ্মের সৌরভ সৌন্দর্য প্রভৃতির যথারীতি বিবরণ দিয়া কবিতার এক জায়গায় ভ্রমরের অবতারণা করা হইয়াছিল। বোধ হয় বলা হইয়াছিল,—প্রস্ফুটিত শতদলের উপর ভ্রমরগুলি যখন মধুলোভে গুন গুন করিয়া উড়িয়া বেড়ায় তখন অপরূপ শোভা হয়। ইহাতে কোনোপ্রকার ক্ষতি হইবার কথা নয় কিন্তু বিপদ হইল ভ্রমরের প্রতিশব্দ লইয়া। ভ্রমরকে ভ্রমর রাখিলেই নবগোপালবাবু প্রশ্ন করিবার অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু তিনি ভ্রমরের স্থানে বসাইয়াছিনে দ্বিরেফ। অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, সমালোচকগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। জীবনস্মৃতিতে কবি রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছেন :

> "দ্বিরেফ এবং ভ্রমর দুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। ঐ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সব চেয়ে বেশি ছিল। দফতরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন।"

বিরুদ্ধ সমালোচকের হাতে বহু আঘাত তিনি আজীবন সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু নিজের আদর্শ হইতে তাঁহাকে কেহ কখনও বিচ্যুত করিতে

পারে নাই। শিশুকবিও নবগোপালবাবুর হাস্য নীরবে সহ্য করিলেন কিন্তু দ্বিরেফ কাটিয়া ভ্রমর করিলেন না।

"নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।"

কবির কবিতার আর একজন প্রতিকূল সমালোচক ছিলেন তাঁহার বউঠাকুরানী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইঁহার প্রভাব বড় কম নয়। সুতরাং তাঁহার কথা একটু বিস্তারিত বলা আবশ্যক। বাংলা সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তের বৎসর তখন বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল সংগীত' আর্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে থাকে। জ্যোতিবাবুর পত্নী সারদামঙ্গলের নিয়মিত পাঠক ছিলেন। কবিও বউঠাকুরানীর কাব্যচর্চার অংশীদার ছিলেন। বিহারীলালের কবিতা যেমন বউঠাকুরানী তেমনি দেবর উভয়েই খুব ভালবাসিতেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের রচিত কবিতা আনিয়া মাঝে মাঝে বউঠাকুরানীকে পড়িয়া শুনাইতেন। কিন্তু তিনি দেবরের কবি-প্রতিভাকে বড়ো একটা আমল দিতেই চাহিতেন না। কবি সেদিনকার কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন :

"কোনো কালে আমি যে লিখিয়ে হব এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনো কালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না।"

বউঠাকুরানীর এই মন্তব্য শুনিয়া কবি যে খুশী হইতে পারিতেন না সে কথা বলাই বাহুল্য।

বউঠাকুরানীর সহিত দেবরের সম্বন্ধটি ছিল বড় মধুর। স্নেহ ও প্রীতির এমন সুসংগত সমন্বয় বড় সুলভ নয়।

শিশুকালে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে মেয়েদের আদর যত্ন তেমন জুটে নাই। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন সেকাল যাই যাই করিয়াও সম্পূর্ণ যায় নাই। "দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়।" বাহিরের প্রকৃতি যেমন তাঁহার কাছ হইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনি। অন্তঃপুর দুষ্প্রবেশ্য ছিল বলিয়াই তাহার দুর্লভতা বালকের কাছে আরও রঙিন হইয়া উঠিত। তিনি মনে মনে সেখানেই আপনার কল্পলোক সৃজন করিয়াছিলেন। "যে জায়গাটাকে ভাষায় বলিয়া থাকে অবরোধ সেই-খানেই সকল বন্ধনের অবসান" দেখিতেন।

উপনয়নের পর হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া "সেই অল্পপরিচিত কল্পনাজড়িত অন্তঃপুরে বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর" পাইলেন। ছেলে-বেলায় মেয়েদের যে স্নেহযত্ন মানুষ না চাহিতেই পায়, আলো বাতাসের মত যে আদর তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, কবি বাল্যকালে সেই আদর যত্ন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তাই হিমালয় হইতে ফিরিয়া যখন দেখিলেন, ভৃত্যদের শাসন শিথিল এবং অন্তঃপুরের বাধা মুক্ত তখন সে আনন্দের উচ্ছ্বাস সংযত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। তিনি মনে করিলেন :

> "বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে—এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের ঘরের সভায় খুব বড়ো একটা আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠাবধূ ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"

এই নববধূটি যখন প্রথম আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে

আসিয়া অকস্মাৎ একদিনেই ঘরের লোক হইয়া উঠিলেন, যিনি একান্ত অপরিচিত হইলেও হঠাৎ নিতান্ত আপনার জন হইয়া পড়িলেন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার সহিত ভাব করিয়া লইবার জন্য বালকের মনে ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। যদি বা কখনও কাছে গিয়া পৌছিতেন অমনি 'ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বিদায় করিতেন। "একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, দুই মনে বড়ো বাজিত।"

নববধূর প্রথম শুভাগমনের[১] স্মৃতি কবির মনে কোনো দিন ম্লান হইতে পায় নাই। পরিণত বয়সের রচনা হইতে তাহার একটি নিদর্শন দিই :

"আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে
সেদিন সে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো,—
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় করে।
... ...
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।
কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়
আলতাপরা পায়ে পায়ে
ইঙ্গিত করল যে সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সে দিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না,

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১২৭৫ সালে। কবির বয়স তখন ৭ বৎসর।

আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।"

এই বিস্ময়ের বেড়া ভাঙিয়া অচেনা মানুষটির কাছে আসিবার জন্য বালকের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। কিন্তু উপায় কি? ভাবিলেন একটা কিছু উপহার দিয়া এ দূরত্বের ব্যবধান কাটাইতে হইবে। কোথা হইতে কতকগুলা রঙিন বই সংগ্রহ করিয়া বউঠাকুরানীর কাছে উপস্থিত হইলেন। আশা ছিল এই উপহারে কাজ হইবে। কিন্তু হইল না। তিনি বলিলেন, এ বই দিয়া কি হইবে? শুধু আশাভঙ্গ নয় রীতিমত উপেক্ষার অপমানে উপহারদাতা বড়ই বেদনা পাইলেন।

কিন্তু অধ্যবসায়ে কি না হয়? বালক দেবর একদিন আবিষ্কার করিলেন:

"ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদ লাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।"[১]

কবির আবিষ্কার যে নিষ্ফল হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ধীরে ধীরে অপরিচয়ের ব্যবধান কাটিয়া গেল। প্রায় সমবয়সী দেবরের সহিত বউঠাকুরানীর ভাব হইতে দেরি হইল না। এদিকে সাবেককালের অবরোধ প্রথাও অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। "বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী; বউঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ির ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল।"

পুতুলের বিবাহ-উৎসবে ভোজের পাতা পড়িত এই ছাদে এবং সেই ভোজের প্রধান অতিথির সম্মানিত আসনে বালক দেবরই একাধিপত্য

১ 'কাঁচা আম', "আকাশ প্রদীপ"

করিতে লাগিলেন। বউঠাকুরানী খুব ভাল রান্না করিতে পারিতেন। আর খাওয়াইতেও ভাল বাসিতেন। দেবরকে দিয়া সেই শখ তিনি সহজেই মিটাইতে পারিতেন।

> "ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না।"

ক্রমে ক্রমে বালক দেবর বউঠাকুরানীর সাহিত্য পাঠের সঙ্গী হইয়া উঠিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিহারীলালের কবিতা দেবর ভ্রাতৃজায়া উভয়েরই প্রিয় ছিল। দুজনে মিলিয়া কবিতার চর্চা করিতেন। দুপুরে এক-একদিন "বঙ্গাধিপ পরাজয়" পড়া হইত। তাহার পর যখন 'বঙ্গদর্শন' দেখা দিল তখনও দুইজনে মিলিয়া তাহা পড়া হইত। কবি ছেলেবেলা হইতেই ভাল করিয়া পড়িতে পারিতেন। বউঠাকুরানী তাঁহার পড়া শুনিতে ভালোবাসিতেন। বঙ্গদর্শন আসিলে কবি পড়িতেন এবং বউঠাকুরানী শুনিতেন।

বউঠাকুরানীর খুব শখ ছিল পাখি পোষার। জীবজন্তুকে খাঁচার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা কবির কিন্তু মোটেই ভাল লাগিত না। একবার তিনি দুইটি কাঠবিড়ালি কিনিয়া খাঁচায় পুরিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবল আপত্তি জানাইয়া বলিলেন,—কাজটা অন্যায় হইতেছে। উত্তরে শুনিলেন, তোমাকে গুরুমশায়গিরি করিতে হইবে না। তর্ক নিষ্ফল জানিয়া কবি প্রাণী দুইটিকে লুকাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কাঠবিড়ালির বন্দিত্বমোচনের দণ্ডস্বরূপ কিছু তিরস্কার অবশ্য সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বউঠাকুরানীর সঙ্গে তাঁহার নানাবিষয়ে তর্ক হইত—সে তর্কে চিরকাল কবির ভাগ্যেই পরাজয় ঘটিয়া আসিয়াছে। আর একটি বিষয়েও তিনি

চিরকাল হার মানিয়াছেন—সে হইল দাবাখেলায়। বউঠাকুরানী দাবা খুব ভাল খেলিতে পারিতেন।

এই কনিষ্ঠ দেবরই বউঠাকুরানীর সকল কাজের সঙ্গী হইয়া উঠিলেন। বাড়িতে ইনিই ছিলেন একমাত্র দেবর সুতরাং বউদিদির আমসত্ত্ব পাহারা দেওয়া প্রভৃতি গুরুকর্মের তিনিই হইলেন প্রধান অংশীদার। বউঠান দেবরের সব বিষয়েই খুঁত ধরিতেন। তাঁহার গানের সুর, তাহার মুখের গড়ন, তাঁহার কবিতার ভাব কিছুই তাঁহার কাছে নিখুঁত বোধ হইত না। তাঁহার মত বালক দেবর হয়তো একদিন পরমার্থতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমার্থ ও পরিহাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে নিশ্চয় তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই।

কবির বাল্যকালে বউঠাকুরানী দেবরের যত দোষই ধরুন না কেন একটি বিষয়ে তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতেন। তাঁহার "সুপুরিকাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরিকাটার কাজটা চলত খুব দৌড় বেগে।"

দেবর ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধটি এমনিভাবে সুপুরিকাটা, কাক তাড়ানো, বই পড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রমশ গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

মেয়েদের বয়স যত শীঘ্র বাড়ে ছেলেদের তত নয়। দেবর ভ্রাতৃজায়ার পরিচয়কালে একজন বালক একজন বালিকা। কিন্তু বালিকা সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বেশী দিন বালিকা রহিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রবীণা হইয়া উঠিলেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। এই বউঠাকুরানীর কাছে দেবর রবীন্দ্রনাথ যে অনাবিল স্নেহ পাইয়াছেন তাহা কেবলমাত্র সখ্য সম্বন্ধের পরিচায়ক নহে। এই বউঠাকুরানী যেন কতকটা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর মত করিয়া মাতৃহারা কনিষ্ঠ দেবরটিকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি যতই বয়স বাড়িতেছে ততই দুজনের মধ্যে ছেলে-মানুষি কমিয়া আসিতেছে। সামান্য কথা লইয়া আর তর্ক উঠিতেছে না, তর্ক উঠিলেও তাহার তাপটা ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল কি সতের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গঙ্গার ধারের একটি বাড়িতে হাওয়া বদল করিতে গিয়াছেন। তখন নূতন বর্ষা নামিয়াছে। সেই সময়ে এক বাদল দিনে "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" বিদ্যাপতির এই প্রসিদ্ধ পদটিতে নিজের সুর বসাইলেন। সুর দেওয়া শেষ হইলে বউঠাকরুনকে গান শোনান হইল, তিনি চুপ করিয়া শুনিলেন কোনও মন্তব্য করিলেন না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

> "বউঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা তা তর্ক নিয়ে কথা কাটাকাটি তখনও চলে কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।"

আজ দেবর ভ্রাতৃজায়া দুজনেই পৃথিবীর সীমা পার হইয়া গিয়াছেন— ভ্রাতৃজায়া আগে দেবর পরে। কবি তাঁহার প্রীতির অভিজ্ঞান রাখিয়াছেন কাব্যে কিন্তু বউঠাকুরানী যে স্মরণচিহ্নখানি কবির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন গঙ্গাজলের তলায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "আকাশ প্রদীপ"-এর একটি কবিতায় তাহার উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন :

"একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাইনি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে

গাছের তলায়, বছরের পর বছর।

ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।"

প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ শ্রোত্রী লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম অন্নপূর্ণা তরখড়। ১৩৫ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বরচিত কবিতা আদি শুনাইতেন। 'ভারতী'তে "কবিকাহিনী" যখন ধারাবাহিকভাবে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথ প্রতি মাসে ভারতী হইতে সেই কাব্য পড়িয়া এবং অনুবাদ করিয়া শ্রীমতী তরখড়কে শুনাইতেন। কবির এই কাব্য ইঁহার এত প্রিয় ছিল যে কবির মুখে বারবার শুনিয়া এবং নিজে পড়িয়া তিনি সমগ্র কবিকাহিনী প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হ তেছিল। এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন :

"এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়া দিলেন।"

এই পত্রিকা শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এগার বৎসর। রবীন্দ্রনাথ এই কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন ১২৮২ সালে, তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। "বনফুল" নামক কবির রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ এই পত্রিকার চতুর্থ বার্ষিক খণ্ডে (১২৮২ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ আশ্বিন-কার্তিক) প্রকাশিত হয়।

বনফুল ১২৮২ সালে প্রথম প্রকাশিত হইলেও উহা রচিত হইয়াছিল আরও পূর্বে। ধরা যাইতে পারে এই কাব্য তাঁহার তের বছর বয়সের রচনা।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১২৮২ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ কার্তিক পর্যন্ত এক এক মাস অন্তর "বনফুল" বাহির হইতে থাকে। কেবল শ্রাবণ ভাদ্র মাসে উপর্যুপরি বাহির হয়।

বার বছর বয়সে কবি যে "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" নামক কাব্য রচনা করেন তাহাকে তাঁহার প্রথম কাব্য ধরিলে "বনফুল"কে তাঁহার দ্বিতীয়

কাব্যগ্রন্থ বলা চলে। "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" কাব্যটি বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অলুপ্ত কাব্যের মধ্যে "বনফুল"ই সবপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু রচনার দিক দিয়া প্রথম হইলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক দিয়া ইহা প্রথম নয়। ১২৮৬ সালে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ১৩৪৭ সালে অর্থাৎ ৬১ বৎসর পরে ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়।[১] মুদ্রিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় এই গ্রন্থকে 'কাব্যোপন্যাস' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বনফুল কাব্যগ্রন্থ আটসর্গে বিভক্ত। ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয় সর্গ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি দিয়া প্রথম সর্গ আরম্ভ হইয়াছে।

"চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে,
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে।"

এই কবিতাটির পরে প্রথম সর্গের পরিচায়ক নাম আছে 'দীপনির্বাণ' দ্বিতীয় সর্গের নাম 'যেও না! যেও না!' তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত চারিটি সর্গের নাম নাই। সপ্তম সর্গের নাম 'শ্মশান' এবং অষ্টম সর্গের নাম 'বিসর্জন'।

শৈশবে মাতৃহীন হইয়া বালিকা কমলা নির্জন বনে বৃদ্ধ পিতার কাছেই বড় হইয়া উঠিতেছিল। তাহার বয়স যখন ষোল বৎসর তখন পিতার মৃত্যু হয়।

"সুখে থেকো চিরকাল! সুখে থেকো চিরকাল
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত!"

এই আশীর্বাদ করিয়া পিতা অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

১ **"রবীন্দ্র-রচনাবলী", অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড**

স্তবধ হৃদয়োচ্ছ্বাস ! স্তবধ হইল শ্বাস !
স্তবধ লোচনতারা ! স্তবধ শরীর !
বিষম শোকের জ্বালা—মূর্চ্ছিয়া পড়িল বালা
কোলের উপরে আছে জনকের শির !
গাইল নির্ঝরবারি বিষাদের গান
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ !"

এইভাবে কমলার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "দীপনির্ব্বাণ" নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় সর্গে বিজয় নামক পথিকের আবির্ভাব। সে তুষারস্তূপের মধ্যে বৃদ্ধের মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া কমলাকে লইয়া লোকালয়ের দিকে চলিল। বনভূমি পরিত্যাগ করিবার সময় সমগ্র অরণ্যপ্রকৃতি তাহার গাছপালা পশুপক্ষী লইয়া যেন তাহাকে বলিতে লাগিল, 'যেও না ! যেও না' ! এই জন্যই দ্বিতীয় সর্গের নাম 'যেও না ! যেও না' !

তৃতীয় সর্গে দেখি কমলা লোকালয়ে আসিয়া তাহার আরণ্যজীবনের কথা ভুলিতে পারিতেছে না। অপরিচিত মনুষ্যপ্রকৃতির সহিত তাহার সহজ মিলন হইতেছে না। বিজয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয় নাই। বিজয়ের বন্ধু নীরদের প্রতি কমলার অনুরাগ।

চতুর্থ সর্গে কমলা নীরদকে স্বীয় অনুরাগের কথা জানাইলে নীরদ বলিল, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রেমের পাত্র। যাহাকে বিবাহ করিয়াছে একমাত্র সেই স্বামীর ভালবাসা লইয়াই তাহাকে সুখে থাকিতে হইবে। কমলা মনুষ্যসংসারে নূতন আসিয়াছে সে এখনও স্বামী পত্নী বিবাহ সমাজ প্রভৃতির অর্থ জানে না। যাহাকে ভাল লাগে তাহাকে ভালবাসিতে পাইবে না কেন, ইহা সে বুঝিতে পারে না। নিরুপায় নীরদ কমলার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

এদিকে সখী নীরজা বিজয়কে ভালবাসে। কিন্তু বিজয়ের হৃদয় পত্নীর প্রতি অনুরক্ত। এই হইল পঞ্চম সর্গের বিষয়।

ষষ্ঠসর্গে ঈর্ষাদগ্ধ বিজয় বন্ধু নীরদকে হত্যা করিল।

সপ্তম সর্গে শ্মশান বর্ণনা। শ্মশানে নীরদের চিতার পার্শ্বে কমলা মূর্ছিতা। রাত্রিশেষে প্রভাতের আলোক মুখে পড়িলে তাহার চৈতন্য হইল। ধীরে ধীরে শ্মশানের ভস্ম শয্যা হইতে উঠিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম সর্গে কমলা আবার তাহার পরিত্যক্ত অরণ্যকুটীরে প্রত্যাবর্তন করিল কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে তো তেমন করিয়া আহ্বান করিয়া লইল না। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় সবই ঠিক আছে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে কি আশ্চর্য ব্যবধান!

"জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা, দুলিবে না পুষ্পলতা
তেমন জীবন্তভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণহীন যেন সবই যেন রে নীরব ছবি
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়।"

এ জীবনভার বহন করা কমলার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে পর্বত-শিখর হইতে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জন করিল। কবি কল্পনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

"কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন!
কমলার প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন!

সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া ভারতীয় গীতিকাব্য সম্বন্ধে একটি বই লিখেন। তাহাতে প্রাচীন পদকর্তারূপে ভানুসিংহকে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি পাইয়াছিলেন।

কবি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাগুলিকে পরিণতবয়সে নিতান্ত নিষ্ঠুর-ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাল্যবয়সের রচনাসমূহের মধ্যে কেবল 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' একালে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পদগুলি সম্বন্ধেও তিনি প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে নাকি "আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো টানা সুর নাই, তাহা আজ-কালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।"

ভারতীতে যখন ভানুসিংহের পদগুলি বাহির হইতে থাকে তখন সম্ভবত এই কবিতাগুলি লইয়া বেশ আলোচনা চলে। তখনও সকলে আসল কবির খোঁজ পায় নাই। যাহারা পায় নাই তাহারা কবিতার মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। যাহারা পাইয়াছিল তাহারা 'মন্দ হয় নাই' বলিয়া পিঠ চাপড়াইতেছিল। ১২৮৬ সালে প্রকাশিত (ভারতী, শ্রাবণ) একটি প্রবন্ধে চ্যাটার্টনের প্রসঙ্গে কবি লিখেন :

"একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভাল কবিতা শুনিলে তাহারা (জন-সাধারণ) বিশ্বাস করিতে চায় যে তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, সে সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয় তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোনো, পদার্থ দেখিতে পায় না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে। যদি বা কেহ সে সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হ্যাঁ কবিতাগুলি মন্দ হয়

নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে বড় হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে। তাহাদের যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই …।"

চ্যাটার্টনের প্রসঙ্গে কবি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা কতকটা স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া মনে হয়।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর আলোচনা যে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল তাহার আর এক প্রমাণ ১২৯১ সালের 'নবজীবন পত্রিকা'য় প্রকাশিত কবির স্বরচিত অনামা ব্যঙ্গ প্রবন্ধ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'। উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কৌতূহলী পাঠক সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিলে পরিহাস-রসিক রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় পাইবেন।

> "ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। … .. আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।" [১]

"কবিকাহিনী" কাব্যগ্রন্থ "বনফুল"-এর পরে রচিত হয়। ১২৮৪ সালের ভারতী পত্রিকার পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত কয় সংখ্যায় ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বনফুল রচিত হয় তের বৎসর বয়সে আর কবিকাহিনী রচনার সময় কবির বয়স ষোল বৎসর। তবে কবিকাহিনী পরে রচিত হইলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সর্বাগ্রে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন :

১ 'নবজীবন', ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৯-৬০

"এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু[১] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।"

কবি বিলাত যাত্রা করেন ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে সেপ্টেম্বর। সুতরাং ঐ তারিখের পূর্বে যে কবিকাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কবির উক্তি হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির এই উক্তি ভ্রমাত্মক মনে করেন। তাঁহার মতে কবির বিলাত যাত্রার পর কবিকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহার উক্তির সপক্ষে দুইটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

প্রথম, ক্যালকাটা গেজেটের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সংকলিত মুদ্রিত পুস্তকের হিসাব। উহাতে দেখা যায় "কবিকাহিনী প্রকাশিত হইলে ৫ নবেম্বর ১৮৭৮ তারিখে সরকারের হস্তগত হইয়াছিল।" যে তারিখে হস্তগত হইয়াছিল বইখানি যে তাহার দুইমাস বা তিনমাস আগে প্রকাশিত হয় নাই তাহার কোনও প্রমাণ ব্রজেন্দ্রবাবু দেখান নাই। বস্তুত বই মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের কাছে পাঠানো হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। আজও দেখিতেছি অনেক পুস্তক প্রকাশের পাঁচ ছয় মাস পরেও সরকারের কাছে পাঠানো হইতেছে। সুতরাং এ প্রমাণের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়, একটি চিঠি। চিঠিটি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বাক্ষরিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' নামক প্রবন্ধে (শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬) প্রথম প্রকাশ করা হয়। 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এও তাহা

১ "কবিকাহিনী"র প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

উদ্ধৃত করা হইয়াছে। চিঠি যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার নাম Ana Turkhud—আনা তরখড়[১]। চিঠি নাকি লেখা হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। এই চিঠিতে তারিখ আছে ২৬ নভেম্বর [১৮৭৮]। ১১ নভেম্বর তারিখে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের একটি পত্র এবং তৎসহ প্রেরিত একটি "কবিকাহিনী" পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তাহারই প্রাপ্তিসংবাদ এই চিঠিতে আছে। ১১ তারিখের চিঠি তিনি কবে পাইয়াছিলেন তাহা চিঠি হইতে জানা যায় না। তবে ১৮।১৯ তারিখের পরে পান নাই ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ ২৬ তারিখে চিঠির জবাব দিতে গিয়া তিনি বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন :

> "I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst. with the copy of "কবিকাহিনী" unacknowledged so long·· "

১১ই তারিখের চিঠি যদি ১৯ তারিখেও বোম্বাই পৌঁছাইয়া থাকে তো সে চিঠি কোথা হইতে আসিল? সে কি কলিকাতা অথবা আমেদাবাদ অথবা ভারতবর্ষের অন্তর্গত আর কোনও স্থান হইতে? ব্রজেন্দ্রবাবু ও সজনীবাবুর উক্তি হইতে তাহাই মনে হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু অন্য এক স্থলে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাষায় লিখিয়াছেন :

> "বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে কবি-কাহিনী পুস্তক রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়া থাকিলে তিনি নিজেই অ্যানাকে একখণ্ড উপহার দিতেন ;—সত্যেন্দ্রনাথ উহা পত্র লিখিয়া পাঠাইতে যাইবেন কেন? সুতরাং 'কবিকাহিনী' যে রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।"

[১] পৃ. ১৩৫ দ্রষ্টব্য

ব্রজেন্দ্রবাবু এবং সজনীবাবু একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর এই তত্ত্বটি খাড়া করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিলাত গেলেন আর সত্যেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেই রহিয়া গেলেন। বস্তুত তাহা নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গেই বিলাত গিয়াছিলেন। এ ঘটনা সকলেরই সুবিদিত। ইহার মধ্যে অনুমানের কোনও অবসর নাই। এই চিঠির ব্যাপারে উঁহারা কাহারও দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া থাকিবেন।

"কবিকাহিনী" চার সর্গে সম্পূর্ণ একটি কাব্য। ইহার নায়ক একজন কবি। কবি জীবনস্মৃতিতে এই গ্রন্থপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

> "যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপ হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি।"

কবিকাহিনীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও কবি ঐরূপই সমালোচনা করিয়াছেন। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক রবীন্দ্রনাথ কখনও কবি-মর্যাদা লাভ করেন নাই, এমন কি অপরে পাছে ভাল বলিয়া ফেলে যেন এই ভয়েই আগেভাগে প্রতিবাদ করিয়া রাখেন। ভানুসিংহের পদ সম্বন্ধে যেরূপ, কবিকাহিনী সম্বন্ধেও সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :

> "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের

কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।”

পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি স্বীয় রচনা সম্বন্ধে লেখকের মতকে সর্বতোভাবে মানিয়া লইলে সুবিচারের পক্ষে বাধা হয়। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের সহিত অপরিণতবয়স্ক বালক রবীন্দ্রনাথের তুলনা করাও কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে সংগত নহে। বনফুল এবং কবিকাহিনীতে যে কবিত্বের সূচনা, পরিণত বয়সের কাব্যে তাহার ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিযুগকে উপেক্ষা করিলে অন্ত্যযুগের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

“রুদ্রচণ্ড” রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম নাটক। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ইহা মুদ্রিত হয় বটে কিন্তু রচনা শেষ হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে কবি বিলাত যান এবং বিলাত যাইবার পূর্বেই যে রচনা সমাপ্ত হয় তাহা গ্রন্থের ‘উপহার’ শীর্ষক কবিতা হইতে বুঝা যায়।[১] গ্রন্থের ‘উপহার’ এইরূপ :

“ভাই জ্যোতিদাদা,

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই !
কোথাও পাইনে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই !
আগ্রহে অধীর হয়ে, ক্ষুদ্র উপহার লয়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।

১ শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘রবিরশ্মি’, পূর্বভাগ, পৃ. ৩৫ দ্রষ্টব্য

ছেলেবেলা হতে ভাই ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হতে আবরি রেখেছ মোরে,
সে স্নেহ আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!”

নামপৃষ্ঠায় এই গ্রন্থকে নাটিকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অঙ্কে গর্ভাঙ্কে নহে, চতুর্দশটি দৃশ্যে ইহা বিভক্ত।

পৃথ্বীরাজ হস্তিনাপুরের অধিপতি ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী রুদ্রচণ্ড তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কন্যা অমিয়াকে লইয়া বনের মধ্যে নির্জন কুটীরে বাস করিতেছিলেন। পৃথ্বীরাজকে কেমন করিয়া শাস্তি দেন, কেমন করিয়া নিজ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন ইহাই রুদ্রচণ্ডের একমাত্র চিন্তা। এদিকে পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদকবির সহিত বালিকার খুব ভাব। ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। শত্রুর সভাসদের সহিত কন্যার এই মেলামেশায় রুদ্রচণ্ড বিরক্ত হন। তিনি কন্যাকে চাঁদ-কবির সহিত মিশিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাহার পরও চাঁদকবিকে কন্যার সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ রুদ্রচণ্ড চাঁদ কবিকে আক্রমণ করেন। দুইজনে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছে তখন অমিয়া ভয়ে মূর্ছিতা হয়। যুদ্ধে রুদ্রচণ্ড পরাজিত হন। চাঁদকবি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া প্রাণ ভিক্ষা দিয়া চলিয়া যান। এমন সময় দূতের মুখে এক সংবাদ পাইয়া চাঁদকবি রাজধানী চলিয়া গেলেন। অমিয়ার কাছে বিদায় লওয়া হইল না। অমিয়ার জ্ঞান হইলে

সে চাঁদকবির সন্ধানে একাকী বাহির হইল। কিন্তু রাজধানীতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইল না।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতেছে শুনিতে পাইয়া চাঁদকবি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মহম্মদ ঘোরীর এক দূত আসিয়া রুদ্রচণ্ডকে বলিল,—প্রতিহিংসার এই স্বর্ণ সুযোগ, তিনি মহম্মদ ঘোরীর সহিত যোগ দিয়া পৃথ্বীরাজকে শাস্তি দিন। এ প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। উদ্দেশ্য পৃথ্বীরাজকে পাইলেই তাঁহাকে হত্যা করিবেন।

চাঁদকবি যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। নেপথ্যে অমিয়ার গান শোনা গেল। কিন্তু তখন আর থামিবার সময় নাই। অমিয়া হতাশ হইয়া পিতার কাছেই ফিরিবার সংকল্প করিল যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। সংবাদ পাইয়া রুদ্রচণ্ড বনে ফিরিলেন। কেবল অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। প্রতিহিংসা ছাড়া তাঁহার জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে তাঁহার জীবন নিরবলম্ব হইয়া পড়িল। তিনি নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন। অমিয়া যখন বনে ফিরিয়া আসিল তখন রুদ্রচণ্ড মুমূর্ষু। এক প্রতিহিংসার জ্বালায় রুদ্রচণ্ড সব ভুলিয়া ছিলেন। হৃদয়ের সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিগুলি যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আজ মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি যে পিতা সে কথা পর্যন্ত এতদিন যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। আজ স্তব্ধপ্রায় হৃদয়ে সেই সুপ্ত পিতৃস্নেহ যেন প্রচণ্ডবেগে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন :

"এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।"

মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে। পৃথ্বীরাজের রাজ্যে

আজ পৃথ্বীরাজের চিহ্নমাত্র নাই। চাঁদকবি দেশত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। অমিয়াকে হয়তো আবার খুঁজিয়া পাইবেন—এ আশা তাঁহার মনে ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে অরণ্যমধ্যস্থ পুরাতন কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে মুমূর্ষু অমিয়া। অমিয়া যেন চাঁদের জন্যই বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিয়াই সে চিরতরে চক্ষু মুদিল।

এই হইল "রুদ্রচণ্ড" নাটকের আখ্যান ভাগ।

"ভগ্নহৃদয়" একটি গীতিনাট্য। ইহা ১৮৮১ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থ-ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন :

'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"

গীতিকাব্য বলা হইলেও ভগ্নহৃদয় গ্রন্থের প্রারম্ভে পাত্রপাত্রীর নাম দেওয়া হইয়াছে। এই গীতিকাব্য তাঁহার আঠার উনিশ বৎসর বয়সের রচনা। বিলাতে থাকিতে ১২৮৬ সালে তিনি ইহা আরম্ভ করেন এবং দেশে ফিরিয়া শেষ করেন। ভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-মাঘ, ১২৮৭) ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৮ সালে। ১৩৪২ এর পূর্বে আর ইহার পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ভগ্নহৃদয় চৌত্রিশ সর্গে সম্পূর্ণ।

ভগ্নহৃদয়ের নায়কও একজন কবি। কাব্যের অন্যতম পাত্র এবং কবির বন্ধু অনিলের ভগ্নী মুরলা ইহার নায়িকা। মুরলা কবিকে ভালবাসে কিন্তু

কবি তাহা জানে না। মুরলাও মুখ ফুটিয়া কবিকে সে কথা কোনও দিন বলে নাই। অথচ কবির মন মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

"প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ যেন ক্ষুদ্র কারাগারে!"

এই রুদ্ধ স্রোতকে মুক্তি দিতে পারিত একজন—সে মুরলা। কিন্তু কবির দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত, অতি নিকটের জিনিস তাহার চোখে পড়িল না।

কাব্যের অন্যতম পাত্রী নলিনী চপলস্বভাব কিশোরী। কবির এক সময় মনে হইল, নলিনীকেই সে ভালবাসে। মুরলার কাছেও কবি সে কথা প্রকাশ করিল। তথাপি মুরলা নিজের কথা মুখ ফুটিয়া বলিল না।

বহুকাল পরে কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যখন মুরলার কাছে ফিরিল তখন মুরলা মৃত্যুশয্যায়।

কাব্য ও নাটক ছাড়াও কবি এই বয়সে কতকগুলি গাথা এবং কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯১ সালে এইগুলি সংগৃহীত হইয়া "শৈশব-সঙ্গীত" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গাথাগুলির দুই একটি গান ছাড়া আর কোনও অংশ পরবর্তী যুগের কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় নাই।

"শৈশব সঙ্গীত"-এর ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন:

"এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিক বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার—

বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু না কিছু গুণ দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।"

"বাল্মীকি প্রতিভা" একখানি গীতিনাট্য। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে ইহা প্রকাশিত হয়। কবির বিলাত যাইবার আগে হইতেই ঠাকুরবাড়িতে "মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত।" কবি বিলাত হইতে আসিবার পর একবার, সম্ভবত ইংরাজী ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১২৮০ ফাল্গুন), এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত এবং অভিনীত হয়। অভিনয়ে কবি স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন :

> "আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিলেন—বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাস-টুকু রহিয়া গিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই দেশী সংগীতের চর্চা করিতেন। বিলাতে গিয়া বিদেশী সংগীতও ভাল করিয়া শিখিয়া আসিলেন।

> "এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল।"

"বাল্মীকি-প্রতিভা" সংগীত ও নাটকের ক্ষেত্রে কবির একটা নূতন পরীক্ষা।

> "ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।···

যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।"

কবি হর্বট স্পেন্সারের একটি লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলেন যে, মানুষের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সুরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। রাগ দুঃখ বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করিবার সময় কথার সহিত সুর আপনি আসিয়া যায়। মানুষের সংগীত এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরেরই উৎকর্ষ সাধনের ফল। স্পেন্সারের এই মত অনুসারে তাঁহার মনে হইয়াছিল "আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।"

এই সঙ্গে আমাদের দেশের কথকতার কথাও তাঁহার মনে পড়ে। কথকতায় বাক্য যদিও মধ্যে মধ্যে সুরকে আশ্রয় করে, তথাপি তাহা তাল-মান-সংগত রীতিমত সংগীত নহে। অথচ উহা পাঠযোগ্য কাব্য-গ্রন্থও নহে। "ইহা সুরে নাটিকা।" ইহাতে গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই বটে, কিন্তু গানকে প্রাধান্যও দেওয়া হয় নাই। ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া গানের তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে।

"কাল-মৃগয়া" একটি গীতিনাট্য। ইহা "বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে অভিনয়ার্থ রচিত" হয়। ছয়টি দৃশ্যে এই গীতিনাট্য সম্পূর্ণ। ১৮৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলা ১২৮৯ সালের ৯ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ভবনে ইহা অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের পূর্বেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। মুদ্রিত গ্রন্থের নামপৃষ্ঠায় প্রকাশের তারিখ আছে, অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

"কাল-মৃগয়া"র বিষয়বস্তু হইল দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ। কবি জীবনস্মৃতিতে ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কাল-মৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্য বিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল।—ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।"

"কাল-মৃগয়া"র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি"তে উল্লিখিত হইয়াছে, বাল্মীকি-প্রতিভা কাল-মৃগয়ার পরবর্তী রচনা। কিন্তু অভিনয় এবং প্রকাশের তারিখ হইতে তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। জীবনস্মৃতিতে কবির নিজের উক্তি হইতেও বাল্মীকি-প্রতিভাই পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া মনে হয়।

কবির প্রথম বয়সের কবিতাগুলি একটি বিষাদগম্ভীর করুণ রসে অভিষিক্ত। কি "শৈশবসংগীত" কি "সন্ধ্যাসংগীত" উভয় গ্রন্থের মধ্যেই একটি সকরুণ হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভাবের দিক হইতে উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আছে, পার্থক্য শুধু প্রকাশের ভঙ্গিতে। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ব পর্যন্ত কবি পূর্বগামী কবিদের, বিশেষত বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাষা ও ছন্দ অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতেই তিনি বাঁধা রীতির বন্ধন প্রথম ভাঙিলেন। ইচ্ছা করিয়া ভাঙিলেন তাহা নহে স্বভাবতই ইহা হইতে মুক্তি পাইলেন। জীবনস্মৃতিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের

প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিন মাত্রামূলক।..... একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিলাম।"

১২৮৮ সালের গোড়ার দিকে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা রচনার সূত্রপাত হয়। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (সম্ভবত সপরিবারে) দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। কবি তখন সেই শূন্য ছাদ ও শূন্য ঘরগুলি অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি একাকী অতিবাহিত করিতেন। এই একাকিত্বই তাঁহার কবিমনকে মুক্তি দিয়াছিল। কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে তিনি বেষ্টিত ছিলেন সঙ্গী সহচরগণের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার ফলে যেন সেই সংস্কারের বেষ্টন খসিয়া গেল। প্রচলিত ছন্দের বন্ধন ভাঙিয়া স্বেচ্ছাকল্পিত নূতন ছন্দে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই একটা কবিতা এইভাবে রচনা হইলে তাঁহার মনে যে আনন্দের উদ্রেক হইল তাহাকে সৃষ্টির আনন্দ বলা চলে। কবি সেই কবিতাগুলি অক্ষয়বাবুকে পড়িয়া শুনাইলেন, অক্ষয়বাবু এ-লেখা দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। অক্ষয়বাবুর অনুমোদন পাইয়া কবির লেখা চলিতে লাগিল।

এই সময় দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার উদ্‌যোগ হয়। টিকিট করিয়া জাহাজে চড়াও হইয়াছিল কিন্তু বিলাত পর্যন্ত পৌছানো হয় নাই। মাদ্রাস হইতেই তিনি ফিরিয়া আসেন। মহর্ষি তখন মুসৌরির পাহাড়ে। কবি প্রথমেই তাঁহার কাছে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে আসিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন চন্দননগরে গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাগানে বাস করিতেছিলেন। এই বাগান মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। বাগানবাড়ির সর্বোচ্চ তলে চারিদিক

খোলা একটি গোল ঘর ছিল। কবি সেইখানে তাঁহার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। "তখনও সন্ধ্যাসংগীতের পালা চলিতেছে।"

মুদ্রিত পুস্তকে প্রকাশের তারিখ আছে ১২৮৮ সাল। কিন্তু ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত একটি কবিতা উহার মধ্যে থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন, ১২৮৮ সালে নহে, ১২৮৯ সালেই সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হয়।[১] ১২৮৮ সালের শেষের দিকে—ধরা যাক চৈত্র মাসে—যদি সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে ঐ গ্রন্থেরই একটি কবিতা কোনও পত্রিকায় বাহির হওয়া এমন বিচিত্র কি? পরবর্তী কালেও প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা গ্রন্থপ্রকাশের পরে মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে।

প্রথম বয়সের সমস্ত কবিতাকে কবি পরিণত বয়সে "কপিবুকের কবিতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সেগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছেন।[২] সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল না। জীবনস্মৃতিতে তিনি সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলিকে "যথেষ্ট কাঁচা" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি সন্ধ্যাসংগীতকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে,

"সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে।"[৩]

১ 'রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয়' .

২ "সন্ধ্যাসংগীত" সম্বন্ধে 'কবির মন্তব্য', "রবীন্দ্র-রচনাবলী ', ১ম খণ্ড

৩ 'ভূমিকা', "কাব্যগ্রন্থাবলী", ১৩২১

বলিয়াছেন :

"তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরেনি তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়।"[১]

কবির এইরূপ স্বীকৃতির ফলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা সন্ধ্যা-সংগীত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই হয়তো সমালোচকগণ পূর্ববর্তী রচনাসমূহকে বিশেষ আমল দেন নাই। আরও একটা কারণ পূর্বের রচনাসমূহ পাঠকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, অন্তত "রবীন্দ্র-রচনাবলী" প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল।

যদিও কবি স্বয়ং কাব্যহিসাবে সন্ধ্যা-সংগীতের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই তথাপি এই সন্ধ্যাসংগীতকে উপলক্ষ্য করিয়াই সেদিন বঙ্গজননী বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়া কিশোর কবির কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়াই কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন :

"সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে।"

ঘটনাটি এইরূপ :

"রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন,—রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে

১ "সন্ধ্যাসংগীত" সম্বন্ধে 'কবির মন্তব্য', "রবীন্দ্র-রচনাবলী", ১ম খণ্ড

উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন, না—তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

কাব্য নাটক গাথা কবিতা সংগীত—এই সকল ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা তো ছিলই, তাহা ছাড়া গদ্য রচনাও বালক রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে অনর্গল নিঃসৃত হইতেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক "বিবিধ প্রসঙ্গ" ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিবিধ প্রসঙ্গ আটত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সমষ্টি। এই আটত্রিশটি প্রবন্ধের সাঁইত্রিশটি তাঁহার ২০।২১ বৎসর বয়সের রচনা। রচনাগুলি ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মননশীলতার যে পরিপক্কতা দেখা যায় বিংশতি বর্ষ বয়স্ক লেখকের পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। অতি ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিন্তিত আলোচনায় সুসম্পূর্ণ। প্রবীণ সমালোচকের পক্ষেও এরূপ ভাবসমৃদ্ধ অল্পায়তন রচনা সহজ নহে। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রবন্ধ এখনও অধিক দেখা যায় না।

এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা যে সুকঠিন তাহা তিনি নিজেও জানিতেন। 'ভারতীর' যে সংখ্যা হইতে বিবিধ প্রসঙ্গ আরম্ভ হয় (শ্রাবণ ১২৮৮) সেই সংখ্যায় একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়াছিলেন। ভূমিকাটি এইরূপ:

"স্মরণ হইতেছে ফরাসীস্ পণ্ডিত প্যাস্কাল একজনকে একটী দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—মার্জনা করিবেন,

সময় অল্প থাকাতে বড় চিঠি লিখিতে হইল, ছোট চিঠি লিখিবার সময় নাই।—আমাদের হাতে যখন বিশেষ সময় থাকিবে তখন মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিব।”

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যাত্রা করেন ১২৮৫ সালের ৫ই আশ্বিন, ইংরেজী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর, এডেন পৌঁছেন ২৮শে সেপ্টেম্বর। এডেন পৌঁছিয়া বাড়িতে প্রথম চিঠি লিখেন। প্রথম বারের বিলাতবাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, ১২৮৬ সালের শেষাশেষি তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সব সাহিত্য রচনা করেন তাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যাত্রাপথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত যে সমস্ত পত্র লিখিয়া বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

“য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র” এই সমস্ত পত্রেরই সংকলন। রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’র সম্পাদকের নামে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছিলেন। ভারতীতে সেই চিঠিগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই পত্রগুলি জনসাধারণের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। অন্যকে লিখিত কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রও লেখকের অনুমতিক্রমে ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হয়। এই পত্র প্রকাশের সময় লেখকের মতামত সম্পর্কে তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভারতীর সম্পাদক কোনও কোনও পত্রের সহিত সম্পাদকীয় মন্তব্যও মুদ্রিত করিয়াছেন এবং পরবর্তী চিঠিতে লেখক তাহার জবাব দিয়াছেন।

কৌতুকের বিষয় এই যে ভারতীর তদানীন্তন সম্পাদক ছিলেন কবির জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সাহিত্যিক বাদ প্রতিবাদে সে সম্বন্ধের উল্লেখ ছিল না। স্নেহ ও শ্রদ্ধার সীমা কিছুমাত্র লঙ্ঘন করা হয় নাই, কিন্তু ভাই বলিয়া সম্পর্কের সুযোগ লইয়া স্বাধীন মত প্রকাশের

পক্ষেও লেখক বা সম্পাদকের তরফ হইতে কেহ কোনও প্রকার বাধার সৃষ্টি করেন নাই।

পত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের আদৌ ছিল না। বন্ধুদের অনুরোধেই এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনিচ্ছার কারণ প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দিয়াছিলেন :

"...প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল, কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই। সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই। বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। "

"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে" একাধারে বহু জিনিস পাওয়া যায়। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বেকার য়ুরোপ-যাত্রীর ভ্রমণ-কাহিনী আজিকার যাত্রীর কাছে অকিঞ্চিৎকর গণ্য হইতে পারে কিন্তু তাহারঐতিহাসিক মূল্যও তো আছে। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি পত্রের বিষয় বস্তু। তাহা ছাড়া একজন এদেশী লোক ও দেশে গেলে পশ্চিমের সমাজ ও সভ্যতা তাহার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাহার মত গঠিত বা পরিবর্তিত করিতে পারে তাহার পরিচয় ইহাতে আছে। এই পুস্তক প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ যে সম্মত হন, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। ঐ ভূমিকাতে আছে :

"ইহাতে আর কোনো উপকার হউক বা না হউক একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"

নিছক ভ্রমণবৃত্তান্ত ইহার পূর্বেও বাহির হইতে পারে কিন্তু এ ধরনের

ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্তন করেন। তাহা ছাড়া পত্র-সাহিত্যেরও ইহাই সূত্রপাত। এই কারণে বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র একটি যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ বলিলে বেশী বলা হইবে না।

শুধু সাহিত্যের নয় ভাষার ইতিহাসেও য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলা চলিত গদ্যকে সাহিত্যেও যে সচলতা দেওয়া যায় এই পুস্তক তাহার প্রথম নিদর্শন। হুতোমী এবং আলালী রীতি যে পরিমাণে ঐতিহাসিক সে পরিমাণে সাহিত্যিক হইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের রীতিও সেকালে সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই, হইয়াছে অনেক পরে। তিনি নিজেও তখন সাহিত্য-রচনায় এ রীতি অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু পত্রাকারে লিখিত বলিয়াই ইহাতে চলিত রীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। উল্লিখিত ভূমিকায় এ সম্পর্কে তাঁহার তখনকার মতটি উল্লেখযোগ্য.

"আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদের সহিত মুখামুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।

পরিণত বয়সে চলিত ভাষার অনুকূলেই তাঁহার মত পরিবর্তিত হইতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার আজ যে মর্যাদা তাহার মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। চলিত ভাষার প্রচলনে 'সবুজপত্র'-এর অনেকখানি হাত ছিল তাহা স্বীকার করি এবং তিনি নিজেও সবুজপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তথাপি ইহা কোনও ক্রমেই বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" এবং 'সবুজ পত্র'—উভয়ের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান বড় কম ছিল না। বাংলা গদ্যরীতির আলোচনায় "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" একটি অপরিহার্য উপাদান ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"বউঠাকুরানীর হাট" উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয় ১২৮৮ সালে। এই উপন্যাস ১২৮৯ সালে সমাপ্ত হয়।

মোরান সাহেবের বাগানে যেমন তাঁহার কাব্যপ্রতিভার স্ফুটতর বিকাশের সূচনা হইয়াছিল তেমনি গদ্য রচনাশক্তির অসংশয় কৃতিত্বের প্রথম প্রকাশও সম্ভবত এইখানেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস [১] "বউঠাকুরানীর হাট" এইখান হইতেই আরম্ভ হয়। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিয়াছেন :

"বোধ করি এই সময়েই বউঠাকুরানীর হাট নামে এক বড়ো নবেল লিখিতে শুরু করিয়াছিলাম।"

মোরান সাহেবের বাগানে কিছুদিন থাকার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌরঙ্গির ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত আসেন। সন্ধ্যাসংগীতের অনেকগুলি কবিতা এবং বউঠাকুরানীর হাটের অধিকাংশ এই বাড়িতে রচিত হয়।

এই উপন্যাসের মধ্যে তখনকার কবিমনের পরিচয়টি ভাল করিয়া পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত হইলেও বউঠাকুরানীর হাটে ইতিহাসটা মুখ্য নয় এমন কি গৌণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা কবিতার সুরে ব্যক্ত হইয়াছে উদয়াদিত্য ও বিভার করুণ কোমল জীবনকাহিনীর মধ্যে তাহারই অনুরণন শুনিতে পাই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :

"ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ ও ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির

১ ইহার পূর্বে "করুণা" নামে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেন। পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন। 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের রুদ্রমূর্তি ও হিংস্র ভীষণতা অপেক্ষা বসন্তরায়ের আনন্দবিভোর সরলতা, উদয়াদিত্যের ম্লান ও বিষণ্ণ মুখচ্ছবি ও বিভার করুণ জীবন কাহিনী আমাদের মনে গভীরতর ভাবে মুদ্রিত থাকে। এই শেষোক্ত চরিত্রগুলি লেখকের গভীর ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার নিজের জীবনপাত্র যে করুণ মধুর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি ইহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।"[১]

বঙ্কিমের পর বঙ্গসাহিত্যে যে নূতন ধারার প্রবর্তন হইল রবীন্দ্রনাথই তাহার পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমের উপন্যাসের ভিত্তিভূমি ছিল ইতিহাস এবং রোমান্স। রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের উপর উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার উপন্যাসে রোমান্স নাই এমন নহে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র রকমের। "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে রোমান্স আছে তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অন্তর্মুখী, বাহ্য বৈচিত্র্যের নিকট সম্পূর্ণই অঋণী।"

বাংলা উপন্যাসকে অসাধারণত্বের আকস্মিকতা হইতে প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ-বিষাদ আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ববহুল সংঘাতসংকুল স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আনিয়া নবজীবনের সঞ্চার করিলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে এই জীবনপ্রবাহই বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হইয়া আসিতেছে। বউঠাকুরানীর হাট হইতেই ইহার সূচনা বলিয়া বাংলা উপন্যাসের পর্যালোচনায় ঐ গ্রন্থের মূল্য অপরিমেয়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনার নিদর্শনস্বরূপে কয়েকটি পুস্তকের নাম করা

১ "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"

হইল। স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত গদ্য ও পদ্য আরও কয়েকটি রচনার কথা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বয়সে তিনি আরও বহুতর লেখা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত এই অল্পপরিসর গ্রন্থে সেই সমস্ত রচনার সুসম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবও নহে।

বৈষ্ণব কবি 'শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল' বলিয়া বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসে সেই শৈশব যৌবনের সন্ধিক্ষণ হইল বিংশ বর্ষ। অশীতিবর্ষব্যাপী জীবনের প্রথম পাদের এইখানে শেষ এবং দ্বিতীয় পাদের এইখানে আরম্ভ। কিন্তু এ তো গেল জীবনেতিহাসের সাল তারিখের গাণিতিক গণনা। রবীন্দ্র-জীবনেতিহাস তো আয়ুষ্কালের হিসাবমাত্র নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও একটি মানুষের জীবনে যাহা কখনও ঘটে নাই রবীন্দ্রজীবনে সেই অঘটন ঘটিয়াছে। সহস্রাংশু-রবিকর-সম্পাতে বিশ্ববাণীর যে চিত্তদল আজ পরিপূর্ণ গৌরবে প্রস্ফুটিত, কবির বিংশ বর্ষ বয়সেই তাহার দলগুলি একটি একটি করিয়া বিকশিত হইতে থাকে। তাহারই রূপে রসে সৌরভে সৌন্দর্যে বিহ্বল হইয়া রবিপ্রতিভার পূর্বাহ্ণ-কালের আতপ্ত মহিমার কথা যেন বিস্মৃত না হই।

নির্ঘণ্ট